রসূলে আজম
মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর
জ্যোতির্ময় গৌরব ও মহিমা

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী
মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর
রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি

ভাষান্তর ঃ শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ প্রকাশনা বিভাগ,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪ বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

প্রথম বাংল্যা সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল – ১৪১৭
শ্রাবণ – ১৪০৩
আগষ্ট – ১৯৯৬

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
৮৫, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকের কথা

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) ঃ আপ্‌নি তাহ্‌রীরুঁ কি রূছে'––শীর্ষক সংকলন গ্রন্থের একাংশের বঙ্গানুবাদ এই পুস্তক। তের শতাধিক পৃষ্ঠার এই সংকলনে আল্লাহ, রসূল (সাঃ), ইসলাম, কোরআন শরীফ, নাজাত, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে উদ্ধৃতি রয়েছে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর বিপুল রচনাসম্ভার থেকে বাছাই ও সংকলনের এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন মোহ্‌তারম সৈয়্যদ দাউদ আহমদ সাহেব, (রবওয়া)। আল্লাপাক তাঁকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অতি উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এই পুস্তকের মূল উর্দূ রচনায় আলোচিত কোরআন শরীফের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যামূলক অর্থ পেশ করা আছে। এই বঙ্গানুবাদে পাঠকের সুবিধার্থে সেই আয়াতগুলির হুবহু তর্জমাও দেওয়া হলো, এবং সেই সঙ্গে আয়াত–নম্বরও। তবে, এখানে নম্বর গণনায় ১ (এক) করে বেশী ধরতে হবে। কেননা, এক্ষেত্রে 'বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহিম'-সহ আয়তের সংখ্যা গণনার যে নিয়ম তা-ই অনুসৃত হয়েছে। এই পুস্তকের প্রুফ দেখেছেন অনুবাদক অসুস্থ চোখ নিয়ে। কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি গোচরীভূত হলে তা আগামীতে সংশোধন করা যাবে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

সাইয়্যেদনা ও মওলানা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে শুভ সংবাদ লাভ করে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি একাদিক্রমে যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে, পূর্ণ হচ্ছে এবং আগামীতেও পূর্ণ হতে থাকবে। আখেরী যামানায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাঁর (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণ হয়ে চলেছে। ফলে, তাঁর (সাঃ) সত্যতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেছে যেমন যমীন ও আসমান, তেমনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন পবিত্র চিত্তের সত্যানুসন্ধানী মানুষেরাও। এবং তাঁরা সবাই একই ভাবে সাক্ষ্যদান করছেন তাঁর (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর সত্যতার স্বপক্ষেও। এই যামানার মাহ্দী ও মসীহ্ (আঃ)-এর জন্য আঁহযরত (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, তিনি (আঃ) মানুষের মাঝে এত বিপুল মাল-সম্পদ বিতরণ করবেন যে, মানুষ সেই ধন-সম্পদ গ্রহণ করতে চাইবে না, কিংবা তা গ্রহণ করে শেষ করতেও পারবে না।

এ তো জানা কথাই যে, আল্লাহতায়ালার নবী-রসূল বা মনোনীত বান্দার আবির্ভাব ঘটে এই পৃথিবীর বুকে, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ধনরাজি বিতরণের জন্য, যে ধনে ধনী হলে মানুষ মনিকেও আর মনি মানে না। এই মনি-মানিক্যেরও উর্দ্ধে যে ধন, সেই অমূল্য ধনই বিতরণ করবেন আখেরী যামানায় ইমাম মাহ্দী (আঃ)। এটাই ছিল মূলতঃ, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর মর্মকথা। এবং আমরা এই সত্য সাক্ষ্য দান করছি যে, আঁহযরত (সাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা পেয়েছে, এবং পূর্ণতা পেয়েই চলেছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর বিপুল রচনাবলী থেকে কিয়দংশ যিনি পাঠ করেছেন, এবং তাঁর হৃদয়ে যদি কিছু মাত্র আলোর কণা থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয় তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, এর বাড়া অমূল্য ধন এই যামানায় আর কেউ বিতরণ করেন নি। আল্লাহ্র ফজলে পবিত্র কোরআনের অফুরন্ত ধনের হারানো খনির সন্ধান পুনরায় যিনি দিয়েছেন মানব-সন্তানকে তিনিই তো মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ)। রসূলে আজম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের গৌরব ও প্রতাপ, মহিমা ও ঔৎকর্ষের আকাশ-ভরা ঐশী আলোর জগতে আবারও যিনি ডাক দিয়েছেন ছোট বড় সকল মানুষকে, জ্বীন ও ইনসানকে, তিনিই তো মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)। তিনিই তো সর্বধর্ম-প্রতিশ্রুত শেষ যুগে আগমনকারী মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী আলাইহিস সালাম।

অথচ, আশ্চর্য যে, মানুষেরা কেউ কেউ বলে কিনা, মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী কোরআন মানে না, রসূল মানে না। সুধী পাঠক ! পুস্তকটি নিরপেক্ষ চিত্তে পাঠ করবার খোশ-নসীব যদি আপনার হয়, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, 'না-মানার' ঐ অভিযোগটা কত বড় একটা মিথ্যা এবং কত ঘনান্ধকারে তার উৎপত্তি!

প্রার্থনা করি, আমাদের সব মানুষের সব হৃদয়ের সকল অন্ধকার দূরীভূত হোক মুহাম্মদীয় প্রদীপ্ত সূর্যের পূত তজল্লীতে, তার অনন্ত ঐশী আলোর সুনির্মল উদ্ভাসনে। আল্লাহ্ করুন, এমনই হোক। এই পরম আশায় আমরা হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র শান ও মোকাম-এর মহান গৌরব ও অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনায় লিখিত হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর রূহানী মনি-মুক্তো-ভরা রচনার ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত কিছু ধন তাঁরই পক্ষ থেকে বিতরণের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষাভাষী সবার সামনে পেশ করলাম। আল্লাহ্ রহমানুর রহীম তাঁর বান্দাগণকে যোগ্যতানুযায়ী এই ধনে ধনী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুণ।

সর্বশেষে এই দোয়া করি ঃ

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের এই কঠিন অনুবাদ কাজটিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর স্বীয় সন্তুষ্টির প্রলেপ দিয়ে কবুল করুন। অনুবাদ দেখে দিয়েছেন মোহ্তারম মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। আল্লাহ্তায়ালা এই পুস্তকটি প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

খাকসার

মকবুল আহমদ খান
ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমীর
আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা
১২ই আগষ্ট, ১৯৯৬ইং

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকেই সব কল্যাণ চিরন্তন,
গৌরবময় সে শিক্ষাদাতা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত জন।' -- (ইলহাম)

(১)

'**সেই** যে সর্বোচ্চ স্তরের 'নূর'-(আলো)
যা ইনসানকে (মানবকে) দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ
ইনসানে কামেলকে (পূর্ণ-মানবকে),
যা ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে ছিল না
নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না,
যা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে ছিল না, নদী সমূহে ছিল না,
ছিল না মুক্তো মানিক্যে, পান্নাতে আর মোতিতেও,
তা ছিল কেবল ইনসানের মধ্যে অর্থাৎ ইনসানে কামেলের মধ্যে,
যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন-
আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীগণের নেতা
অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা
মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।
অতএব, সেই নূর দান করা হয়েছে সেই মানবকেই, এবং
মর্যাদা অনুপাতে তাঁর রঙে রঙিন সেই সকল মানুষকেও
যারা নিজেদের মধ্যে কিছু না কিছু সেই রঙ রাখে.............
........এবং এই মর্যাদা সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তমরূপে পাওয়া যায় আমাদের নেতা আমাদের প্রভু আমাদের হাদী, নবীয়ে উম্মী, সাদেকে মসদুক (সত্য ও সত্যতায় পরীক্ষিত) মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম -এর মধ্যে।'

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ১৬০, ১৬১

(২)

'আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয়নি। সেই 'তওহীদ' (আল্লাহর একত্ব) যা দুনিয়া থেকে গুম হয়ে গিয়েছিল, তিনিই এক মাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সাঃ) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী এবং সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাংখিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও

কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণ বা ফয়েজ সমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ট্রেজারী তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, সে চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জিন্দা খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি-তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়তের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি।' – ('হকীকাতুল ওহী'-পৃঃ ১১৫, ১১৬)

(৩)

'হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানবাত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, এবং সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কোরআন ; এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁর আধ্যাত্মিক জিন্দেগী ও পবিত্র গৌরবের এই প্রমান আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রুহুল কুদ্দুসকে (পবিত্র আত্মা বা জিব্রাঈলকে) পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।'

– (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃঃ ১১)।

(৪)

'সেই ইন্সান যিনি তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর কাজে কর্মে, তাঁর নিরন্তর তৎপরতায় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও পবিত্র মানসিক ক্ষমতা সমূহের মাধ্যমে -জ্ঞানে, কর্মে, সাধুতায় ও দৃঢ়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবরূপে অভিহিত হয়েছেন.... সেই ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল বা পারফেক্ট এবং প্রকৃত অর্থেই যিনি ইনসানে কামেল এবং কামেল নবী এবং যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কেয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই কল্যাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া ইমামুল আস্ফিয়া খাতামুল মুরসালীন ফখরুন্নবীঈন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। হে আমাদের খোদা! তুমি সই প্রিয়তম নবীর উপরে সেই রহমত ও দরুদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যাবধি অন্য কারো উপরেই বর্ষণ করনি। যদি এই আজিমুশ্শান, মহামহিমান্বিত নবী দুনিয়ার বুকে না আসতেন, তাহলে যে সকল ছোট ছোট নবী যেমন, ইউসুফ (আঃ) আইয়ুব (আঃ) মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আঃ), মালাকী (আঃ), ইয়াহ্ইয়া (আঃ) , জাকারিয়া (আঃ) ইত্যাদি, তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণই

থাকতো না, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খোদাতায়ালার প্রিয়পাত্র। এ তো সেই নবীরই (সাঃ) কৃপা বা এহ্‌সান যার দরুন এঁরা সবাই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হতে পেরেছেন।

'আল্লাহুম্মা সাল্লে ওয়া সাল্লাম ওয়া বারেক আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া আস্‌হাবেহি আজমাঈন।

ওয়া আখেরুদ্দাওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহে রব্বিল আ'লামিন। ।'

– (এতমামুল হুজ্জত, পৃঃ ৩৬)।

(৫)

'যখন আমরা ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখি, তখন আমরা নবুয়্যতের সারাটা শিক্ষাদিক্ষার মধ্যে মাত্র এমন একজনকেই দেখতে পাই যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার সাহসী নবী, জীবন্ত নবী এবং খোদাতায়ালার অত্যুচ্চ মর্যাদার প্রিয় নবী, এবং যিনি নবীগণের নেতা, রসুলগণের গৌরব এবং সকল প্রেরিত পুরুষগণের মাথার মুকুট, এবং তাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তফা আহ্‌মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাঁর ছায়ার মধ্যে দশ দিন চলতে পারলেই সেই আলো লাভ করা যায়, যা ইতিপূর্বে হাজার বছরেও লাভ করা সম্ভব হতো না। ------অতএব, শেষ ওছিয়্যত এটাই যে, আমরা প্রত্যেক প্রকারের আলো প্রাপ্ত হয়েছি সেই রসুল সেই উম্মী নবীর আনুগত্যের মাধ্যমে ,এবং যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে সেও তা প্রাপ্ত হবে। সে এমন কবুলিয়াত বা স্বীকৃতি লাভ করবে যে, তার জন্য কোন কিছুই আর অসম্ভব থাকবে না। জীবন্ত খোদা, যিনি মানুষের কাছে গুপ্ত রয়েছেন, তিনি তার খোদা হয়ে যাবেন, এবং সমস্ত মিথ্যা-খোদা তার পদতলে পিষ্ট হয়ে যাবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সে সর্বত্রই কল্যাণমণ্ডিত হবে এবং ঐশী শক্তিসমূহ তার সঙ্গী হবে। (আস্‌সালামো আলা মানেত্তাবায়াল হুদা-যে হেদায়াতের অনুসরণ করে তার প্রতি সালাম)।' –(সিরাজুম মুনীর, পৃঃ ৮২)।

(৬)

'এখন আসমানের নীচে মাত্র একজনই নবী আছেন, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে; অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম-যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নত এবং উত্তম এবং সকল রসূলগণের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এর্বং যিনি নবীগণের মোহর, মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদাতায়ালাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে; এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। এবং কোরআন শরীফ-যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণ হেদায়াত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইল্‌ম ও মারেফাত বা প্রকৃত জ্ঞান এবং খোদার উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায়, এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতা সমূহ থেকে মুক্ত হয়, এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে বা মাকামে পৌঁছে যায়।'- – (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ৫৩৫, পাদটীকা)।

'পৃথিবীতে পবিত্র-স্বভাবের কোটি কোটি মানুষ অতীত হয়ে গেছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন, কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা উন্নত, ও সর্বাপেক্ষ উত্তম সেই মর্দে খোদা বা খোদার পুরুষকে পেয়েছি যাঁর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।'

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

('নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপরে রহমত নাযেল করছেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাঁর জন্য রহমত প্রার্থনা করছে। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত প্রার্থনা কর (দরুদ পাঠ কর) এবং পরিপূর্ণ শান্তি কামনা কর'। আহ্যাব ঃ ৫৭।)।

ঐ সকল জাতির পবিত্র পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও যাদের কথা কোরআন শরীফে বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি। আমরা কেবল তাঁদের সম্পর্কেই বলছি যাঁদের উল্লেখ আছে কোরআন শরীফে । যেমন, হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত ঈসা (তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক), এবং অন্যান্য নবীগণ(আঃ), আমরা খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, যদি আঁহযরত(সাঃ) দুনিয়াতে না আসতেন এবং কোরআন শরীফ নাযেল না হতো, এবং ঐ সকল কল্যাণ আমরা স্বচক্ষে না দেখতাম যা আমরা দেখতে পেয়েছি, তাহলে, অতীতের সমস্ত নবীগণের সত্যতা আমাদের কাছে সন্দেহযুক্ত থেকে যেত। কেননা, শুধু কেচ্ছা -কাহিনী থেকে বাস্তব জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়, এবং তাদের প্রতি সে সব মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনার কথা আরোপ করা হয়, সেগুলিও সব অতিরঞ্জিত। কেননা, সেগুলোর নাম-নিশানাও এখন আর বাকী নেই। বরং ঐ সকল অতীত কেতাবগুলি থেকে খোদাতায়ালার অস্তিত্বেরই কোন সত্যিকার প্রমাণ মিলে না। কারণ, সেগুলি থেকে এই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে না যে, খোদা মানুষের সাথে কথা বলেন। কিন্তু আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর ঐ সকল কেচ্ছা-কাহিনী বাস্তবতার রঙে রঙিন হতে পেরেছে। এখন আমরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, এটা শুধু কথার কথা নয়, বরং এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা যে, খোদা কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলেন, কীভাবে খোদার নিদর্শন প্রদর্শিত হয় এবং কীভাবেই বা দোয়া বা প্রার্থনা কবুল হয় এবং এ সমস্ত কিছুই আমরা পেয়েছি আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে কেচ্ছা-কাহিনীর আকারে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে আমরা তা সবই পরখ করতে পেরেছি। অতএব আমরা এমন এক নবীর আঁচল ধরেছি যিনি 'খোদা-নোমা' অর্থাৎ তিনি খোদাকে প্রদর্শিত করেছেন আমাদের কাছে। জনৈক (কবি) কতই না সুন্দর বলেছেন এই কবিতায় ঃ

মুহাম্মদ আরাবী (সাঃ) দু'জাহানের বাদ্শাহ্
দুয়ারে যাঁর দ্বারওয়ানী করে রুহুল কুদ্দুস,
তাঁকে খোদা তো বলতে পারিনা, তবে বলি যে,
তাঁকে সম্মান করাতেই নিহিত খোদাকে সম্মান করা। '

'আমরা কেমন করে যে সেই খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো, যে খোদা আমাদেরকে এমন এক নবীর আনুগত্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন, যিনি সাধুগণের আত্মাদের জন্য বস্তু জগতের সূর্যের মতই এক সূর্য, যা কিনা এক অন্ধকার সময়ে উদিত

হয়েছে এবং আপন আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। তিনি না থেমেছেন, না পরিশ্রান্ত হয়েছেন যতক্ষণ না তিনি আরবের সকল অঞ্চলকে শিরক বা অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র করেছেন। তিনি নিজেই নিজের সত্যতার দলীল। কেননা, তাঁর আলো প্রত্যেক যামানাতেই বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর সত্যিকার আনুগত্য মানুষকে পবিত্র করে ঠিক তেমনিভাবে, যেভাবে ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে ছাফ ও স্বচ্ছ নদীর পানি। কে আছে এমন যে, সে পূর্ণ আন্তরিকতাসহ আমাদের কাছে এসেছে, অথচ ঐ আলো প্রত্যক্ষ করেনি? এবং কে সেই ব্যক্তি, যে খাঁটি নিয়্যতে ঐ দরজার কড়া নেড়েছে অথচ তার জন্যে দরজা খোলা হয়নি? কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষের স্বভাবই এ রকম যে, তারা ইতর জীবনযাপনই পছন্দ করে এবং তারা এটা চায় না যে, আলো তাদের অন্তরে প্রবেশ করুক।' – (চশ্‌মা মারেফাত, পৃঃ২৮৮)।

(৮)

قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا 'বল, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার মহিমা এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাত এবং তোমার গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান দান কর। এবং (কোরআন করীমের) অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

'এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি; এবং আমি আত্ম-সমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম' (৬ঃ১৬৪)। এই উভয় আয়াতকে একত্রে পাঠ করলে বুঝা যায় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁকে আউয়ালুল মুসলেমীন বা আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার তাৎপর্য এটাই যে, তিনি (সাঃ) ঐশী জ্ঞান বা মারেফাতের বিষয়ে অন্য সকলের চাইতে বেশী জ্ঞানী। এজন্যই তাঁর (সাঃ) 'ইসলাম' অন্যান্য সব কিছুর চাইতে উন্নত। এবং তিনিই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম, আউয়ালুল মুস্‌লেমীন। আঁহযরত(সাঃ)-এর এই বিশাল ও বিপুল জ্ঞানরাশির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আরও একটি আয়াতেঃ যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেছেন ঃ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا 'এবং যা তুমি জানতেনা, তা তোমাকে শিখিয়েছেন এবং তোমার উপর আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে' -(৪ঃ১১৪)।

অর্থাৎ, খোদা তায়ালা তোমাকে সেই সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন, যা তুমি নিজে নিজে জানতে পারতে না। এবং আল্লাহর বিশেষ কৃপার কারণেই সর্বাপেক্ষা অধিক ঐশী কল্যাণরাজি বা ফয়জানে ইলাহী বর্ষিত হয়েছে তোমার উপরে। অর্থাৎ তুমি সুক্ষ্ম ঐশী জ্ঞান বা মারেফাত এবং গোপন রহস্যাবলী এবং আল্লাহ্ সম্পর্কিত সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরাপর সকলের চাইতে অধিক অগ্রগামী হয়েছ। এবং খোদাতায়ালা তাঁর মারেফাতের আতর দিয়ে তোমাকেই সিক্ত করেছেন সর্বাপেক্ষা বেশী। তাই, আল্লাহ তায়ালা ইল্‌ম ও মারেফাতকে অর্থাৎ জ্ঞান ও ঐশী-তত্ত্বের উপলব্ধিকে ইসলামের প্রকৃত ধারনা লাভের প্রধান উপায় নির্ধারণ করেছেন। যদিও সেই জ্ঞান আহরণের অন্যান্য উপায়ও আছে, যেমন রোজা, নামাজ, দোয়া এবং অন্য সব আহকামে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র আদেশাবলী, যেগুলির সংখ্যা ছ'শয়ের সামান্য কিছু বেশী হবে; তথাপি, আল্লাহতায়ালার আজমত বা মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর একত্ব, তাঁর জালালী ও জামালী বা গৌরবের ও সৌন্দর্যের গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল। যে ব্যক্তির হৃদয় গাফেল এবং ঐশী

মারেফাত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত , সে কী করে তৌফিক বা সামর্থ্য পাবে যে, সে রোজা রাখবে, নামাজ আদায় করবে এবং দোয়া করবে, এবং সৎকাজে ব্যাপৃত থাকবে? এই যাবতীয় সৎকর্মের প্রেরণা তো আসে মারেফাতে ইলাহী থেকেই। এবং এথেকেই তো সৃষ্টি হয় অন্যান্য সকল উপায়, সৃষ্টি হয় তার সকল শাখা-প্রশাখা । এবং এই মারেফাতের শুরু হচ্ছে খোদাতায়ালার 'রহমানিয়াত'-এর প্রতিফলন; এ না কোনও কর্মের ফল, না কোনও দোয়ার। এ স্রেফ খোদাতায়ালার অনুগ্রহের দান। তিনি যাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, যাকে চাহেন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন।

পুনরায় তার এই মারেফাত সৎকর্মে ও ঈমানের সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয় এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে; পরিশেষে তার প্রতি ইলহাম বা ঐশীবাণী অবতীর্ন হওয়া শুরু হয় এবং হৃদয়ের সারাটা আঙ্গিনাকে আলোকিত করে তোলে এবং সেই আলোরই নাম ইসলাম। সেই পূর্ণ মারেফাতের স্তরে পৌঁছে গিয়ে ইসলাম শুধু কথার কথায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা এ সম্পর্কিত সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান, যার বর্ণনা আমি দিয়েছি তা সমস্তই অর্জিত হয়ে যায়। এবং মানবাত্মা সম্পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্র একত্বের সামনে সিজদা বিনত হয়। তখন উভয় পক্ষ থেকেই এই আওয়াজ উত্থিত হয় যে, যা কিছু আমার, তা সবই তোমার। অর্থাৎ বান্দার আত্মাও এই কথা বলতে থাকে এবং এই স্বীকৃতি জানাতে থাকে যে, হে ইলাহী! যা কিছু আমার, তা তো তোমারই। এবং খোদা তায়ালাও বলতে থাকেন এবং শুভ সংবাদ দিতে থাকেন যে, হে আমার বান্দা! পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী ও অন্যান্য যা কিছু আমার সাথে আছে, তা সব কিছুই তোমার সাথেও আছে। এই মর্যাদার ইঙ্গিত যে আয়াতে দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে ঃ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا 'তুমি বল,হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। ' – (৩৯:৫৪)।

এই আয়াতে قُلْ يٰعِبَادَ اللّٰهِ (বল, হে আল্লাহর বান্দাগণ!)-এর পরিবর্তে বলা হয়েছে قُلْ يٰعِبَادِيَ (বল, হে আমার বান্দাগণ)। এখানে এই পদ্ধতি অনুসরণের রহস্য এটাই যে, এই আয়াত এজন্যই নাযিল হয়েছে যে, এর দ্বারা যেন খোদাতায়ালার সীমাহীন রহমতের শুভ সংবাদ দান করা হয় এবং যারা প্রচুর পাপ করে হতাশ হয়ে পড়েছে তাদেরকে যেন আশ্বাস দেওয়া হয়, সান্ত্বনা দেওয়া হয়। সুতরাং, আল্লাহ জাল্লাশানুহু এই আয়াতে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, যেন আপন রহমতের এই দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেন এবং বান্দাদেরকে দেখিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর কৃতজ্ঞ, ওফাদার বান্দাদেরকে কত বেশী করে বিশেষ বিশেষ নেয়ামতে ভূষিত করতে পারেন। সুতরাং, ঐ 'কোল ইয়া এবাদী'-কথাটির দ্বারা এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে,-'দেখো! আমার এই প্রিয়তম রসূলকে দেখো! এই বরগুযিদা বান্দা তার পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে কত না উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছে! এখানে যা কিছু আমার তা সবই তার। যে ব্যক্তি পরিত্রাণ চায় তার উচিত তার (সাঃ) গোলাম হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তার (সাঃ) আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে যাওয়া, যেন সে তার (সাঃ) এক বান্দা হয়ে গেছে। তখন, সে প্রথমে যত নিকৃষ্ট পাপীই থাকুক না কেন, তাকে ক্ষমা করা হবে। জানা দরকার যে,

'আব্দ্' শব্দটির একটা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোলাম বা দাস। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেছেন ঃ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

('একজন মুমিন গোলাম একজন মুশরেক গোলামের চাইতে ভাল'-২ঃ২২২)।

উক্ত আয়াতে (৩৯ঃ৫৪) এই কথার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিজের নাজাত বা পরিত্রাণ চায়, সে যেন এই নবীর (সাঃ) সঙ্গে গোলামীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং সম্পূর্ণরূপেই তাঁর (সাঃ) গোলাম হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর কোনও হুকুমের বাইরে যেন সে না যায়। এবং তাঁর আনুগত্যের রশিতে নিজেকে এমনভাবে বেঁধে রাখে যেন সে তাঁর (সাঃ) এক গোলাম ছাড়া আর কিছু নয়। তবেই সে নাজাত পাবে। এই মোকামে সেই সকল অন্ধকার -আত্মার তথাকথিত তৌহিদবাদীদের প্রতি আফসোস যে, তাদের বিবেচনায় গোলাম নবী, গোলাম রসুল, গোলাম মোস্তফা, গোলাম আহ্মদ, গোলাম মুহাম্মদ ইত্যাদি নামগুলি নাকি শিরকের মধ্যে পড়ে। অথচ, উল্লিখিত আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে,এই নামগুলিই হচ্ছে পরিত্রাণের উপায়। এবং যেহেতু, 'আব্দ'-এর মধ্যে এই তাৎপর্যই নিহিত যে, এইরূপ ব্যাক্তি প্রত্যেক প্রকারের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করবে, স্বকীয়তা বর্জন করবে এবং সম্পূর্ণ রূপে আপন প্রভুর অনুগত ও অনুরক্ত হবে। সেহেতু, সত্যানুসন্ধানীদেরকে প্রবুদ্ধ করা হয়েছে যে, যদি তারা নাজাত বা পরিত্রাণ পেতে চায়, তাহলে তারা যেন নিজেদের মধ্যে ঐ অবস্থার সৃষ্টি করে নেয়। এই আয়াত তত্ত্বগতদিক থেকে আরও একটি আয়াতের অনুরূপ এবং তা হচ্ছে ঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

'বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও, তবে আমার আনুগত্য কর, তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।'(৩ঃ৩২)।

এই আয়াতের তাৎপর্য পূর্বোক্ত আয়াতের তাৎপর্যের মতই। কারণ, পূর্ণ অনুগমন সেই একাগ্রতা ও সেই একনিষ্ঠ আনুগত্যকেই চায়, যা নিহিত আছে 'আব্দ' -এর মধ্যে। এটাই সেই তাৎপর্য যে জন্য আয়াতে শুধু ক্ষমার অঙ্গীকারই নেই বরং মাহ্বুবে ইলাহী অর্থাৎ খোদাতায়ালার প্রিয়পাত্র হওয়ার শুভ সংবাদও দেওয়া হয়েছে। আয়াত 'কোল ইয়া এবাদী'-(বল, হে আমার বান্দারা)-এর অর্থ অন্য কথায়-'কোল্ ইয়া মুত্তাবেয়ী' (বল, হে আমার অনুসারীবৃন্দ)! তোমরা যারা পাপে নিপতিত রয়েছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হইও না। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের বরকতে মাফ করে দিবেন। কিন্তু যদি, 'এবাদি'-এর অর্থ করা হয় 'আল্লাহ্তায়ালার বান্দা' তাহলে এর অর্থ বিকৃত করা হবে। কেননা, এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, খোদাতায়ালা ঈমান-এর শর্ত পূরণ করা ছাড়াই এবং -আঁহযরত(সাঃ)এর আনুগত্য করা ছাড়াই তামাম মুশরেক ও কাফেরদেরকে এমনিতেই মাফ করে দিবেন। এই রূপ অর্থ করা হলে তো, তা হবে কোরআনের প্রকৃত ও সুস্পষ্ট শিক্ষারই সম্পূর্ণ পরিপন্থী!

এক্ষেত্রে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতের তাৎপর্য এটাও যে, যে ব্যক্তি মনপ্রাণ দিয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোলাম হয়ে যাবে,তাকে সেই আলো, সেই ঈমান,

সেই মহব্বত ও সেই ইশ্‌ক্ দান করা হবে, যা তাকে গায়ের আল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু)থেকে মুক্ত করবে। এবং সে যাবতীয় পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। এবং তাকে প্রবৃত্তির তাড়নার সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবর থেকে বের করে আনা হবে। এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এই হাদীসেও ঃ 'আনাল হাশেরুল্লাযি ইয়াহ্‌শেরুন্নাসু আলা কদ্‌মী'–

'অর্থাৎ আমিই সেই পুনরুত্থানকারী যার পদচিহ্ন অনুসরণে লোকদেরকে উত্থিত করা হয়।' বস্তুতঃ কোরআন করীমের ভাষায় এইরূপ রূপকের ব্যবহার প্রচুর যে, দুনিয়া মরে গিয়েছিল, খোদাতায়ালা তাঁর নবী খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করে পৃথিবীকে নতুন করে জিন্দা করেছেন, যেমন তিনি বলেছেনঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ 'জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পৃথিবীকে জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর (৫৭ঃ১৮) অর্থাৎ ; এই কথা শুনে রাখ যে, পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর খোদাতায়ালা জীবিত করে থাকেন। আবার, একইভাবে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের (রাজি আল্লাহু আনহুম) ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে, وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ(৫৮ঃ২৩), অর্থাৎ তাদেরকে পবিত্র আত্মা বা রুহুল কুদ্দুসের দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এবং রুহুল কুদ্দুসের সাহায্য এটাই যে, তা হৃদয়গুলিকে জিন্দা করে এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ দান করে এবং পবিত্র শক্তি পবিত্র বোধ ও অনুভূতি, এবং পবিত্র জ্ঞান দান করে,এবং সুন্দর প্রত্যয় ও অকাট্য দলীল -প্রমাণের মাধ্যমে খোদাতায়ালার সান্নিধ্যের মোকামে উপনীত করে। ------- এবং এই যে জ্ঞান যার উপরে পরিত্রাণ বা নাজাত নির্ভরশীল, তা নিশ্চিতরূপে এবং নিরংকুশভাবে , সেই জীবন লাভ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয় যা রুহুল কুদ্দুসের মাধ্যমে মানুষ পেয়ে থাকে। এবং কোরআন করীম অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই দাবী করে যে, ঐ আধ্যাত্মিক জীবন কেবল এই রসূলে করীম (সাঃ) -এর আনুগত্যের ফলেই পাওয়া যায়। এবং ঐ সমস্ত লোক যারা এই নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্যকে অস্বীকার করে, তারা মৃত, তাদের মধ্যে সেই জীবনের স্পন্দন নেই। আধ্যাত্মিক জীবন বলতে মানুষের সেই ইল্‌মী ও আমলী (জ্ঞানের ও কর্মের) শক্তিসমূহকেই বোঝায় যা সবই জীবন্ত হয়ে ওঠে রুহুল কুদ্দুসের সাহায্যে । কোরআন করীম থেকে প্রমানিত হয় যে, যে সকল আদেশাবলীর উপরে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার সংখ্যা ছয় শ'। এর মোকাবেলায় (অর্থাৎ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে) জিব্রাঈল আলাইহেস সালামের পাখার সংখ্যাও ছয় শ'। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মানবত্বের (বাশারিয়াতের) ডিম ঐ ছয় শত আদেশকে মাথার উপরে রেখে জিব্রাঈলের সমস্ত পাখার নীচে আসে, ততক্ষণ তার মধ্যে 'ফানা ফিল্লাহ্' হওয়ার বাচ্চা পয়দা হয় না। এবং ইনসানী হকীকতও (মানবীয় প্রকৃতি) নিজের মধ্যে ছয়শত ডিমের ধারণ ক্ষমতা রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তির ছয়শত ডিম জিব্রাঈলের ছয়শত পাখার ধারণ ক্ষমতার নীচে এসে গেছে, সে ব্যক্তি ইনসানে কামেল বা পারফেক্ট মানুষ; এবং তার এই জন্ম পারফেক্ট জন্ম এবং এই জীবন পারফেক্ট বা কামেল জীবন। এবং গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাশারিয়াতের (মানবত্বের) ডিমের রূহানী বাচ্চা যা রুহুল কুদ্দুসের মাধ্যমে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কল্যাণে জন্মলাভ করে তা আপন মূল্যমানে,

জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, আকৃতি-প্রকৃতিতে এবং অবস্থাতে সমস্ত নবীগণের বাচ্চাদের চাইতে উত্তম ও পরিপূর্ণ। এই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহজাল্লা শানুহু বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'অর্থাৎ তোমরাই সকল জাতির চাইতে উৎকৃষ্ট, যাদেরকে উত্থিত করা হয়েছে মানবজাতির সংশোধন ও কল্যাণের জন্য।' (৩ঃ১১১)।

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ১৮৬-১৯৭)।

(৯)

'পৃথিবীতে এক রাসূল এসেছেন, যেন বধির যারা তারা শুনতে পায়; তারা যে শুধু আজই বধির এমন নয়, বরং তারা হাজারো বছর ধরে বধির হয়ে আছে। কারা অন্ধ এবং কারাইবা বধির? তারাই, যারা তৌহিদ বা খোদার একত্বকে কবুল করেনি। কবুল করেনি এই রসূলকে যিনি নতুন করে দুনিয়াতে তৌহিদ কায়েম করেছেন। সেই রসূল যিনি বন্যদেরকে মানুষ বানিয়েছেন; এবং মানুষকে সচ্চরিত্র মানুষে অর্থাৎ সত্যিকার নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। পুনরায় সেই চরিত্রবান মানুষকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষে উন্নীত করার জন্য ঐশী রঙে রঙিন করে তুলেছেন। সেই রসূল, হ্যাঁ সেই সে সত্যের সূর্য, যাঁর চরণে হাজারো মানুষ যারা শির্‌ক, নাস্তিকতা ও কলুষিত জীবনযাপনের মধ্যে মরেই গিয়েছিল, তারা পুনরায় জীবন লাভ করেছে। এবং দুনিয়াতে এক কেয়ামতের নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে । এ যীশুর কথার ন্যায় শুধু কথার কথা ছিল না। তিনি দুনিয়াকে অন্ধকারের মধ্যে পেয়ে তাকে এমন আলো দান করেছেন যে, অন্ধকার রাত্রিকে আলোকের দিবসে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা কী ছিল, এবং তাঁর আগমনের পরে পৃথিবীর অবস্থা কী হয়েছিল? এটা এমন কোন প্রশ্ন নয় যে, তার জবাব দেওয়া মুশকিল। যদি আমরা কোন বেঈমানীর রাস্তা অবলম্বন না করি, তাহলে, আমাদের বিবেক অবশ্যই আমাদের জামার আঁচল ধরে টান দিয়ে আমাদেরকে একথা মানতে বাধ্য করবে যে, সেই জনাবে আলী (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে প্রত্যেকটি দেশের মানুষ খোদা তায়ালার মহিমাকে ভুলে গিয়েছিল। এবং সেই সত্য মাবুদ বা উপাস্যের মহিমা আরোপ করেছিল অবতার, পাথর, নক্ষত্র, বৃক্ষ, জানোয়ার ও মরণশীল মানবের প্রতি। এবং এই তুচ্ছ সৃষ্টিকেই বসিয়েছিল সেই পবিত্রতা ও গৌরবের অধিপতির স্থানে। আর এটাই যদি সত্য হয় যে, এই সব মানুষ, জন্তু, নক্ষত্র, বৃক্ষ প্রভৃতি আসলে খোদাই ছিল-যাদের মধ্যে যীশুও একজন -তাহলে, এ রসূলের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, যদি এই সকল বস্তু খোদা না হয়, তাহলে, অবশ্যই সেই দাবীর মধ্যে রয়েছে এক মহামহিমান্বিত জ্যোতি, যা করেছিলেন মক্কার পাহাড়ের উপরে সাইয়্যেদনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম । কি ছিল সেই দাবী? সেই দাবী তো এটাই ছিল যে, যেমন তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, খোদাতায়ালা দুনিয়াকে শির্‌কের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখতে পেয়ে সেই অন্ধকাররাশিকে দূরীভূত করার জন্যে আমাকে প্রেরণ করেছেন। এ যে মাত্র একটা দাবীই ছিল তা নয়, বরং সেই রসূলে মকবুল (সাঃ) সেই দাবীকে পূর্ণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি কোন নবীর শ্রেষ্ঠত্ব, সেই নবীর সেই কর্মের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়, যে কর্মের দ্বারা তাঁর মানুষের প্রতি ভালবাসা অন্য সব নবীদের চাইতে অধিক বলে প্রমানিত হয়, তাহলে, হে লোক সকল উঠো এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এক্ষেত্রে পৃথিবীর বুকে

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন তুলনা নেই। ----------- অন্ধ সৃষ্টি-উপাসকরা সেই মহান নবীকে (সাঃ) চিনতে পারেনি, যিনি সত্য সহানুভূতির হাজারো দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু, আজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সেই সময় এসে গেছে যখন সেই পবিত্র রসূলকে(সাঃ) পুনরায় সনাক্ত করা হবে। চাইলে ,আমার এ কথা লিখে রাখতে পার যে, এখন থেকে মৃতের উপাসনা দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকবে, এবং অবশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষ কি খোদার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? তুচ্ছ বিন্দু কি খোদার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিবে? মরণশীল আদম সন্তানের পরিকল্পনা কি ঐশী আদেশাবলীকে লাঞ্ছিত করবে? হে, যারা শুনতে পাও তারা শুনে রাখো! এবং হে যারা চিন্তা করতে সক্ষম, তারা চিন্তা করে দেখো! এবং মনে রেখো যে, সত্য প্রকাশিত হবেই এবং সেই যে সত্য, আলো তার বিচ্ছুরিত হবেই।' -(তবলীগে রেসালাত, খ. ৬,পৃ.৯)।

(১০)

'আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং ভালবাসা মানুষকে অবশেষে খোদাতায়ালার প্রিয় বান্দায় পরিণত করে। তখন, খোদা সেই মানব-হৃদয়ে আপন প্রেমের এক আগুন উদ্দীপ্ত করে দেন। এবং সেই মানুষ অন্য সমস্ত কিছু থেকে তার হৃদয়কে মুক্ত করে নিয়ে খোদাতায়ালার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তখন তার প্রেম-ভালবাসা, তার ইচ্ছা -অভিলাষ সব কিছুই একমাত্র খোদা তায়ালার জন্য হয়ে যায়। তখন মহব্বতে ইলাহীর এক খাস তাজাল্লী অর্থাৎ ঐশী প্রেমের এক বিশেষ বিচ্ছুরণ তার উপরে পতিত হয়। এবং তাকে ইশ্‌ক্ ও মহব্বতের পূর্ণ রঙে রঙিন করে প্রবল শক্তিতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তখন সে তার প্রবৃত্তির তাড়নার উপরে জয়লাভ করে। তখন তার সমর্থনে ও সাহায্যে সব দিক থেকেই খোদা তায়ালার অসাধারন কার্যাবলী নিদর্শনের আকারে প্রকাশিত হতে থাকে'। - (হকীকাতুল ওহী, পৃ. ৬৫)।

(১১)

'দরুদ শরীফের তোফায়েল বা মধ্যস্থতা'-----------আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালার আশিস ও কল্যাণরাজি আশ্চর্য আলোর আকারে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এবং সেখানে গিয়ে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সিনার (বুকের) ভেতর বিশোষিত হয়ে যাচ্ছে, এবং সেখান থেকে আবার বের হয়ে অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত হয়ে প্রত্যেক হকদার বা প্রাপকের কাছে, তার ধারন-ক্ষমতার অনুপাতে, পৌঁছে যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত যে, কোন প্রকার অনুগ্রহ বা কল্যাণই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যম ব্যাতিরেকে কারো কাছেই পৌঁছতে পারে না। দরুদ শরীফ কী জিনিষ? এ তো সেই প্রার্থনা, যা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাতিরে (আল্লাহ্‌র) সেই আরশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যেখান থেকে আলোকের ধারা সমূহ উৎসারিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার আশিস ও অনুগ্রহ, ফয়েজ ও ফজল লাভ করতে চায় তার অবশ্যই উচিত যে, সে যেন প্রচুর পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করে, যাতে করে সেই আশিস ও অনুগ্রহের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়'।

-(আল-হাকাম, ২৮ শে ফেব্রেুয়ারী , ১৯০৩, পৃ.৭)।

(১২)

'এক রাতে এই বেচারা এতো অধিক পরিমানে দরূদ শরীফ পাঠ করেছিল যে, এতে তার মন ও প্রাণ সুঘ্রাণে ঘ্রাণময় হয়ে উঠেছিল। ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, ফেরেশতারা স্বচ্ছ পানির ন্যায় আলো-ভর্তি মশ্‌ক (চামড়ার তৈরী পানি বহনের বৃহৎ ব্যাগ) বহন করে করে আমার গৃহে প্রবেশ করছে। এবং তাদের মধ্য থেকে একজন বললোঃ 'এ হচ্ছে সেই সমস্ত আশিস ও কল্যাণরাজি যা তুমি প্রেরণ করেছিলে মুহাম্মদ-এর প্রতি (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম)।'-

-(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ৫৭৬ , উপ-পাদটীকা ৬)।

(১৩)

'মনের মধ্যে এই রূপ কোন সন্দেহের স্থান দেওয়া ঠিক হবে না যে, কী করে এক সামান্য উম্মতির (অনুসারীর) পক্ষে রসূলে মকবুল (সাঃ) -এর নামসমূহের ও গুণাবলীর এবং প্রশংসার অংশীদার হওয়া সম্ভব হতে পারে। সন্দেহ নেই, সত্য এটাই যে, হকীকি অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে কোন নবীও আঁহযরত (সাঃ) -এর পবিত্র ঔৎকর্ষসমূহের সমভাগী হতে পারেন না। বরং, এক্ষেত্রে এমনকি ফেরেশ্‌তাবৃন্দের সমকক্ষতারও কোন অবকাশ নেই, অন্য কারো কথা তো দূরস্থান যে, সে আঁহযরত (সাঃ) এর কোন উৎকর্ষতার কোনও অংশীদার হয়। কিন্তু, হে সত্যের অনুসন্ধান কারী ! আল্লাহ্ তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুণ! তুমি অবধানপূর্বক এই কথা শ্রবন কর যে, খোদাওন্দ করীমের উদ্দেশ্যে হচ্ছে, যেন এই রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর বরকত বা কল্যাণসমূহ সর্বদা প্রকাশিত হতে থাকে, যেন সর্বদা তাঁর (সাঃ) নূর, তাঁর কবুলিয়াতের অত্যুজ্জ্বল রশ্মিসমূহ বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং তা যেন বিরুদ্ধবাদীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারে , যেন তাদেরকে লা-জওয়াব করে দিতে পারে। এজন্যেই তিনি তাঁর পরিপূর্ণ হেকমত ও রহমতের দ্বারা এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকে কোন কোন ব্যাক্তি এমন হয়ে থাকে যারা চরম বিনয় ও ভক্তির সঙ্গে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য গ্রহণ করে এবং নম্রতার আস্তানায় সিজদা বিনত হয়ে সম্পূর্ণরূপে অহং মুক্ত হয়, খোদা তাদেরকে বিলীন অবস্থায় এক স্বচ্ছ আয়নার মত পেয়ে আপন রসূলে মকবুল (সাঃ) -এর কল্যাণরাজি তাদের বিনীত সত্তায় প্রকাশিত করেন। এবং তাদের যে তারিফ আল্লাহ্‌র সমীপে করা হয়, কিংবা যে প্রভাব এবং কল্যাণ এবং নিদর্শন তাদের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সমস্ত প্রশংসারই মূল উৎস এবং সেই সকল কল্যাণ ও নিদর্শনের আসল প্রস্রবন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এবং সত্যিকার অর্থে ও পারফেক্টরূপে ঐ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। এবং সেগুলির সর্বোত্তম প্রমাণও তিনি স্বয়ং। কিন্তু যেহেতু সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) -এর পথ ও সুন্নতের অনুসারী ব্যক্তি তার ঐকান্তিক আনুগত্যের কারণে তাঁর (সাঃ) প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয়ে যায়, সেহেতু, যে ঐশী আলোর প্রকাশ ঘটে হযরত নবী করীম (সাঃ) -এর মধ্যে তারও প্রতিফলন ঘটে ঐ অনুসারীর মধ্যে। তাকে তখন আসলের ছায়া রূপে চিহ্নিত করা হয়। অতএব, সেই পবিত্র ব্যাক্তি-সত্তার মধ্যে যে সমস্ত ঐশী আলো পয়দা হয় এবং প্রকাশিত হয়, তা সব কিছুই তাঁর (সাঃ) সেই ছায়ার মধ্য দিয়েও পরিস্ফুট হয়, প্রকাশিত হয়। এই ছায়ার মধ্যে ঐ সমস্ত অবস্থা ও উপায় প্রকাশিত হওয়াটা, যা কিনা তার আসল-এর মধ্যে বিদ্যমান,

এমন একটি বিষয়, যা কারো কাছেই গোপন নয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, এই ছায়া আপনা আপনি তার সত্তায় কায়েম নয়। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার মধ্যে কোন ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্বও নেই। বরং, যা কিছু তার মধ্যে পাওয়া যায়, তার সব কিছুই সেই আসল ব্যক্তিসত্তারই ছবি মাত্র, যা তার মধ্যে বিম্বিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। সুতরাং, আপনি কিম্বা অন্য কোনও ব্যক্তি যেন এটা মনে না করেন যে, এটা একটা ক্ষতির অবস্থা। কেননা, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাতেনী আনওয়ার বা গোপন আলোসমূহ তাঁর উম্মতের মধ্যেকার পূর্ণ আনুগত্যকারী ব্যক্তিদের কাছেও পৌঁছে যায়। এটাও বুঝতে হবে যে, এই সকল আলোকের প্রতিফলন থেকে, যা চিরস্থায়ী ফয়েজ বা কল্যাণরূপে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার লোকদের মধ্যে প্রাকশিত হয়, দুটো মহৎ বিষয়ের উৎপত্তি হয় ঃ (এক), এথেকে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরম উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়; কারণ, যে প্রদীপ থেকে অন্যান্য প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং সেগুলিও যদি সর্বদা আলো দান করে, তাহলে, তা সেই প্রদীপ থেকে উৎকৃষ্ট যা থেকে অন্য আর কোন প্রদীপ জ্বালানো যায় না। (দুই), এই চিরস্থায়ী কল্যাণ থেকে প্রমানিত হয় যে, এই উম্মত অন্যান্য সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠতর। এবং এর দ্বারা ইসলাম ধর্মের হকীকত ও সত্যতার সর্বদা জীবন্ত থাকাও সাব্যস্ত হয়। বিগত যামানার পুরাতন কেচ্ছা-কাহিনীর উপরে নির্ভর করবার প্রয়োজন হয় না। এছাড়াও, এ এমন একটি বিষয় যে, এর দ্বারা কোরআন শরীফের সত্যতার আলো সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের উপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমান চূড়ান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে, ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনা এবং অবমাননা এবং হতাশা সম্পুর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কেননা, তারা ইসলামের মধ্যে এমন সব কল্যাণ ও আলো দেখতে পায়, যা তাদের নিজ নিজ জাতির পাদ্রী, পণ্ডিত প্রভৃতি লোকদের মধ্যে দেখতে পায় না।

হে সত্যান্বেষী! বিষয়টা বিবেচনা করে দেখুন। আল্লাহ্ আপনাকে সত্যের সন্ধানে সহায়তা করুন। ---------খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের শান ও মর্যাদা কতই না মহান ও উন্নত! তাঁর সত্যতার সূর্যের আলোর প্রভাব কতই না মহীয়ান! যার অনুসরণ কাউকে পূর্ণ বিশ্বাসী বা মুমিন-এ-কামেল বানিয়ে দেয়, কাউকে আরেফ (খোদার পরিচয় জানা ব্যক্তি) এবং কাউকে বা আয়াতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র নিদর্শন) এবং হুজ্জাতুল্লাহ্র (আল্লাহ্র প্রমাণের) মর্তবা বা মর্যাদা দান করে এবং তার প্রতি ঐশী প্রশংসা বর্ষিত হয়।' – (বারাহীনে আহ্মদীয়া , পৃ. ২৫৮-২৬১, উপ-হাশিয়া ১)।

(১৪)

'যখন দুনিয়াতে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহা কল্যাণময় সত্তায় সাধুতার সূর্য উদিত হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার ব্যক্তি, যাঁরা ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখেন, তাঁরা ঐশী কালাম ও রসূল মকবুল (সাঃ)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উন্নত স্তরসমূহে উন্নীত হয়েছেন এবং হয়ে চলেছেন। খোদাতায়ালা তাঁদের উপর বিরামহীনভাবে এতো বেশী কৃপা এবং প্রাচূর্য এবং সমর্থন ও সাহায্য করেছেন যে, স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ঐ সকল মানুষ খোদাতায়ালার প্রিয়ভাজন এবং তাঁরা সবাই ঐশী প্রাচুর্যের মহতী ছায়ার তলে অবস্থিত এবং ঐশী কৃপায় ভূষিত। এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা পরিষ্কার দেখতে পায় যে, তাঁরা সবাই

অসাধারন অনুগ্রহরাজি দ্বারা সম্মানিত এবং তাঁরা বিস্ময়কর সব কেরামত বা নিদর্শন দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সুচিহ্নিত। এবং তাঁরা ঐশী ভালবাসার আঘ্রাণে ঘ্রাণময়, এবং খোদা কতৃক গৃহীত হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত। সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার আলো তাঁদের সাহচর্যে, তাঁদের ধ্যানে, তাঁদের হিম্মতে, তাদের প্রার্থনায়, তাঁদের দৃষ্টিতে, তাঁদের নৈতিকতায়, তাঁদের জীবনধারায়, তাঁদের আনন্দে, তাঁদের ক্রোধে, তাঁদের ইচ্ছা-আকাংখায়, তাঁদের ঘৃণায়, তাঁদের তৎপরতায়, তাঁদের আরামে, তাঁদের কথাবার্তায়, তাঁদের নীরবতায়, তাঁদের জাহিরে, তাঁদের বাতেনে, (প্রকাশে ও গোপনতায়) এতো ভরপূর যে, মনে হয় যেন একটি অতি পরিষ্কার স্বচ্ছ কাঁচের পাত্র অতি উচ্চ মানের আতর দ্বারা কানায় কানায় ভরা। তাঁদের সাহচর্যে এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টিতে এবং তাঁদের ভালবাসার কল্যাণে যা অর্জন করা সম্ভব তা প্রচুর চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এবং তাঁদের শুভ কামনা করলে ঈমানের অবস্থা এক নতুন রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, এবং নৈতিক চরিত্র ঔৎকর্ষ প্রদর্শনের শাক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। এবং নফ্‌স্ বা অহং-এর কোলাহল ও পাপ-প্রবনতা থেমে যায়, এবং পক্ষান্তরে প্রশান্তি ও মধুরতার সৃষ্টি হয়। তখন, ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুপাতে প্রত্যেকের ঈমান উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, এবং প্রেম ও অনুরক্তি প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা স্মরণের আনন্দানুভূতি বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি তাঁদের সাহচর্যে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করে, সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানী শক্তিতে, নৈতিক গুণাবলীতে, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ধ্যানে ও সাধনায়, আল্লাহ্‌র সহিত ভালবাসায় এবং বান্দার প্রতি দয়া-মমতায়, এবং বিশ্বস্ততায়, রেজামন্দিতে ও দৃঢ়তায় এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে, পৃথিবীতে তার তুলনা মেলা ভার। সুস্থ বুদ্ধি সহসাই অনুধাবন করতে পারে যে, সেই বন্ধন ও সেই জিঞ্জীর তার পা থেকে খসে পড়েছে, যার দ্বারা অন্য লোকেরা গ্রেফ্‌তার হয়ে আছে। এবং সেই সংকীর্ণতা ও সেই কুণ্ঠা যার দ্বারা অন্য লোকদের হৃদয় সঙ্কুচিত ও শ্রান্ত, তা সবই তাঁদের হৃদয় থেকে অপসৃত হয়ে গেছে। তাঁরা খোদাতায়ালর সঙ্গে অনবরত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত এবং পূনঃপুনঃ ও স্থায়ীভাবে প্রচারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত। তাঁরা খোদা এবং খোদার ঐ সকল বান্দা যারা নির্দেশ ও হেদায়াত লাভের জন্য আগ্রহী, তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী রূপেও গৃহীত। তাঁদের উজ্জ্বলতা অন্যদের হৃদয়কে আলোকিত করে। বসন্তের আগমনে যেমন প্রকৃতির বুকে সবুজের সমারোহ দেখা দেয়, তেমনি, তাঁদের আবির্ভাবে স্বভাবের আলো অন্তরের শুভ চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে ; এবং আপনা-আপনি প্রত্যেক ভাগ্যবান ব্যক্তির প্রাণেই আকাংখা জেগে ওঠে, সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টার মাধ্যমে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে প্রকাশিত করতে পারে এবং স্বপ্ন-কল্পনা ও অলসতার আবরণ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে। সে যেন পাপ-প্রবনতা থেকে পরিত্রাণ পায়, পাপাচারের চিহ্নসমূহ মুছে ফেলতে পারে, অজ্ঞতার অন্ধকার ও অসচেতন বা বেখবরীর অবস্থা থেকে উদ্ধার পায়। তাঁদের মুবারক যামানার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, এবং তখন আলোর এরূপ প্রসারণ ও বিচ্ছুরণ ঘটে যে, প্রত্যেক মুমিন ও সত্যান্বেষী আপন আপন ঈমানী ক্ষমতার অনুপাতে নিজের প্রাণের মধ্যে বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই, প্রসারতা ও দ্বীনদারির প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখতে পায়। তার সংকল্প বা হিম্মত বৃদ্ধি পায়, শক্তিলাভ করে। প্রত্যেক মুখলেস ব্যক্তি তার পূর্ণ আনুগত্য

বা কামেল এতায়াতের বরকতে এবং তার আন্তরিকতার অনুপাতে সেই প্রাণ মাতানো আতরের আঘ্রাণে আনন্দিত হয়। কিন্তু, যে সমস্ত লোক চির-দুর্ভাগ্য তারা এথেকে কোন কিছুই পায় না। বরং, তারা আরও বেশী তাঁদের শত্রুতায়, হিংসায়, বিদ্বেষে, বদ-চেতনায় বেড়ে যায় এবং পরিশেষে হাবিয়া (জ্বলন্ত) জাহান্নামে পতিত হয়। এদেরই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ

(আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ের উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন ২ঃ৮)

– (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, ৫০৭-৫১০, উপ-ফুটনোট৩)।

(১৫)

'আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাবী সূর্যের ন্যায় আলো বিচ্ছুরণ করছে, এবং আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চিরন্তন জীবনের এ এক বড় শক্তিশালী প্রমাণ যে, সেই প্রশংসিত পুরুষের (সাঃ) কৃপারাশিও চিরন্তনরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি, যে ব্যক্তি এই যামানাতেও আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, সন্দেহ নেই যে, তাকে কবর থেকে উঠানো হয়, এবং তাকে এক আধ্যাত্মিক জীবন দান করা হয়। এ কোন কল্পনা নয়, বরং তা বাস্তবেই প্রকাশিত হয় তার সাধুতার কার্যকারিতা দ্বারা। এবং আসমানী সাহায্য ও কল্যাণরাজি এবং রুহুল কুদ্দুস বা পবিত্র আত্মার অসামান্য সমর্থন সর্বদা তার সঙ্গী হয়। সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। এমন কি, খোদাতায়ালা তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দেন, এবং তার উপরে বিশিষ্ট রহস্যাবলী প্রকাশিত করতে থাকেন, এবং আপন তত্ত্বজ্ঞান ও সুক্ষ্মজ্ঞানের ভাণ্ডার তার কাছে উন্মোচিত করে দেন। এবং আপনার ভালবাসা ও অনুগ্রহের লক্ষণসমূহ তার মধ্যে বিকশিত করতে থাকেন। এবং আপনার সাহায্যাবলী তার উপরে বর্ষণ করতে থাকেন। এবং আপন কল্যাণরাশি তার মধ্যে সংস্থাপিত করেন। এবং তাকে আপন রবুবিয়্যতের (প্রভু-প্রতিপালকত্বের) আয়নায় রূপান্তরিত করেন। তার জবান থেকে হেকমত ও প্রজ্ঞার বাণী উচ্চারিত হতে থাকে। তার হৃদয় থেকে সব সুক্ষ্ম জ্ঞানের প্রস্রবন উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তার নিকটে গোপন রহস্যাবলীর ভেদ উন্মোচিত হয়। এবং খোদাতায়ালা তার উপরে এক আজিমুশ্‌শান তাজাল্লী-এক অতি মহিমামণ্ডিত জ্যোতির প্রকাশ সংঘটিত করেন। এবং তার সন্নিকটবর্তী হয়ে যান। তখন সে তার দোয়া বা প্রার্থনার জবাব প্রাপ্তিতে, আপনার কবুলিয়্যত বা স্বীকৃতিতে, নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাতের দূয়ারসমূহ উন্মুক্ত করণে, এবং গোপন রহস্যাবলীর ভেদ উন্মোচনে, এবং তার উপরে আশিস ও কল্যাণরাশির বর্ষণে সবার উপরে উত্তীর্ণ হয় এবং সকলের উপরে জয়যুক্ত হয়।

বস্তুতঃ খোদাতায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, উল্লিখিত বিষয়াদির কারণে এবং চূড়ান্তভাবে প্রমান দেওয়ার উদ্দেশ্যে, এই বেচারা, এই আজেজ, এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার নামজাদা বিরুদ্ধবাদীদের কাছে কয়েক হাজার পত্র রেজিস্ট্রি ডাক যোগে পাঠিয়েছিল, যাতে করে এ ব্যাপারে তাদের কারো এই দাবী থাকলে সে যেন তা পেশ করতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক জীবন খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ছাড়াও, অন্য কারো মাধ্যমেও পাওয়া যায়। এবং (তার এইরূপ দাবীর স্বপক্ষে পারলে) সে যেন এই আজেজের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়। আর সে

যদি তা না করে, তাহলে সে যেন সত্যান্বেষী হয়ে একদিকে আশিস ও মঙ্গল লাভের আশায় এবং অপরদিকে ঐশী-নিদর্শনাবলী দর্শনের উদ্দেশ্যে আমার নিকটে উপস্থিত হয়। কিন্তু, কেউই সততার সঙ্গে সৎ উদ্দেশ্যে এদিকে মুখ ফেরায়নি; বরং দূরে দূরে থেকে এবং এড়িয়ে চলে এটাই প্রমানিত করেছে যে,তারা সবাই অন্ধকারের মধ্যে নিপতিত হয়ে আছে।' – (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ.২২১-২২২)।

(১৬)

'আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, খোদাতায়ালার সব চাইতে বড় নবী এবং সবচাইতে অধিক ভালবাসার পাত্র হচ্ছেন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লাম। কেননা, অন্যান্য নবীগনের উম্মতেরা সবাই অন্ধকারে পড়ে আছেন এবং তাদের কাছে বাকি আছে শুধু অতীতের কেচ্ছা কাহিনী। কিন্তু এই উম্মত হামেশাই খোদাতায়ালার কাছ থেকে তাজা তাজা নিদর্শন পেয়ে থাকে। এ কারণেই এই উম্মতের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক আরেফ ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁরা খোদাতায়ালার উপরে এরূপ উঁচু স্তরের দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা যেন খোদাকে দেখতে পান। কিন্তু খোদাতায়ালা সম্পর্কে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস অন্য আর কোনও জাতির ভাগ্যে জুটে ওঠে না। অতএব, আমাদের আত্মা থেকে এই সাক্ষ্য উত্থিত হয় যে, সত্য এবং সঠিক ধর্ম একমাত্র **ইসলাম**।..........

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহেওয়া সাল্লাম-এর **মোজেজা** বা অলৌকিক নিদর্শন সমূহ কোন কেচ্ছাকাহিনীর কথা নয়, বরং আমরাও নিজেরা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, অনুবর্তিতা করে, অনুরূপ নিদর্শন লাভ করে থাকি। সুতরাং, এ ভাবেই আমরা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কল্যাণে হক্কুল ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে পর্যন্ত পৌছে যাই। কত না উন্নত সেই পূর্ণ-পারফেক্ট, সেই পবিত্র নবী (সাঃ)-এর মর্যাদা ও মহিমা যাঁর নবুয়্যত হামেশাই সত্যান্বেষীর কাছে তাজা নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকে। এবং আমরা অনবরত নিদর্শন দেখার কল্যাণে এমন এক উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাই যে, সেখান থেকে আমরা যেন স্বচক্ষে খোদাতায়ালাকে দেখতে পাই। অতএব, ধর্ম তাকেই বলা যায়, এবং সত্য নবী তিনিই হতে পারেন, যাঁর সত্যতায় ভরা বসন্ত সর্বদা দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেবল কেচ্ছাকাহিনী, যার মধ্যে হাজার রকমের কমবেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার উপরে নির্ভর করাটা কোন জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়। পৃথিবীতে শত শত লোককে খোদা বানানো হয়েছে, এবং শত শত পুরান কাহিনীর ভিত্তিতে তাদের মানাও হচ্ছে। কিন্তু আসল কথা তো এটাই যে, সত্য কেরামত (অলৌকিক কার্য) কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাঁর কেরামতের সাগর কখনই শুকিয়ে যায় না। এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের নেতা ও প্রভু নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। খোদাতায়ালা প্রত্যেক যামানাতে সেই কামেল ও পবিত্র পুরুষের নিদর্শন দেখাবার জন্য কোন না কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। এবং এই যামানায় মসীহ মাওউদ নাম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। দেখো! আসমান থেকে নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে চলেছে, এবং থেকে থেহৈ বিভিন্ন প্রকারের অসামান্য ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে চলেছে। এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তি আমার কাছে থেকে নিদর্শনাবলী

দেখতে পারে, তা সেই ব্যক্তি খৃস্টান, ইহুদী, আর আর্যই হোক না কেন। এবং এ সমস্ত কল্যাণ হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের।'

'মুহাম্মদ (সাঃ) উভয় জগতের ইমাম ও প্রদীপ,
মুহাম্মদ (সাঃ) আকাশ ও পৃথিবী আলোকিত কারী।
আমি খোদাতায়ালার ভয়ে তাঁকে খোদা তো বলতে পারি না,
কিন্তু, খোদার কসম, তাঁর সত্তা মর্তবাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পণ।'

– (কেতাবুল বারিয়াহ্, পৃঃ ১৫৫-১৫৭, পাদটীকা)।

(১৭)

'আধ্যাত্মিক জিন্দেগী পাওয়া যায় একমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় অস্তিত্বের মধ্যে। খোদাতায়ালার হাজারো রহমত সর্বদা বর্ষিত হোক তাঁর উপরে . . . . . নিরর্থক সেই জীবন যার দ্বারা পরের মঙ্গল সাধন হয় না, এবং ব্যর্থকাম সেই অস্তিত্ব যার মধ্যে কোন আশিস নেই। দুনিয়াতে মাত্র দুটি জিন্দেগী প্রশংসার যোগ্যঃ (১) সেই হাঈয়ুন ও কাইয়ুম অর্থাৎ চির-জীবন্ত ও চিরস্থায়ী (আল্লাহ্), যিনি সকল কৃপা ও কল্যাণের উৎস; এবং (২) সেই জিন্দেগী যা কৃপা ও কল্যাণময়ী এবং খোদা–নোমা অর্থাৎ খোদা–প্রদর্শক। সুতরাং, আস! আমরা দেখিয়ে দেব যে, সেই জিন্দেগী হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জিন্দেগী, যার পক্ষে প্রত্যেক যামানাতে আসমান সাক্ষ্যদান করে এসেছে এবং এখনও দিয়ে চলেছে। স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি কল্যাণকর জীবনযাপন করে না সে মৃত, সে জীবিত নয়। আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার নাম নিয়ে মিথ্যা বলা কঠিন অপরাধ, খোদা আমাকে আমার মান্যবর, যাঁর আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য, সেই সাইয়্যেদনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক চিরস্থায়ী জিন্দেগীর এবং তাঁর গৌরব ও সাফল্যের এই প্রমাণ দিয়েছেন যে, আমি তাঁর আনুগত্য করে, তাঁকে ভালবেসে আমার নিজের উপরে আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখেছি এবং হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাস বা ইয়াকীনের আলোয় ভরপূর পেয়েছি। এবং আমি এতো বেশী অদৃশ্য বা গায়েবী নিদর্শন দেখেছি যে, সেগুলোর উদ্ভাসিত আলোকের মাধ্যমে আমি খোদাকে দেখতে পেয়েছি।'

– (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃঃ ১০-১১)

(১৮)

আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবস্থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে যত বেশী পূর্ণতায় উপনীত হতে দেখা গেছে, তত বেশী রুহুল কুদ্দুসের সাহায্য ও আলো দ্বারা তিনি সাহায্য পুষ্ট ও আলোকিত হয়েছেন। এবং তা দেখিয়েও দিয়েছেন আমাদের সেই নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁর কর্মের ও আচরণের মাধ্যমে। এমনকি, তাঁর আলোরাশি ও কল্যাণরাজির পরিধি এতো ব্যাপক ও বিশাল যে, তার নমুনা ও তার প্রতিফলন চিরন্তনরূপে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ, এ যুগেও যা কিছু খোদাতায়ালার আশিস ও মঙ্গল অবতীর্ণ হয়ে চলেছে, তা তাঁরই আনুগত্য এবং তাঁরই অনুবর্তিতার কারণে পাওয়া যাচ্ছে। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে পুণ্যবান এবং খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বলে চিহ্নিত হতে পারবে না; সেই সমস্ত নেয়ামত ও বরকত, মারেফাত, হকীকত ও কাশ্‌ফ্ বা বিদ্যদৃষ্টি-যা উন্নত স্তরের

পবিত্র আত্মা লাভ করে থাকে-তার অধিকারী হতে পারবে না, যদি না সে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে বিলীন হয়। এবং এর প্রমাণও রয়েছে স্বয়ং খোদাতায়ালার কালামের মধ্যেইঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন')-(৩ঃ৩২)।

এবং খোদাতায়ালার এই দাবীর বাস্তব ও জীবন্ত প্রমাণ আমি নিজেই। তোমরা সেই সকল নিদর্শন ও লক্ষণাদি-যা কিনা খোদাতায়ালার প্রিয় পাত্রদের এবং ওলীদের জন্য কোরআন শরীফে নির্ধারিত করে দেয়া আছে-তার দ্বারা আমাকে সনাক্ত করতে পার।

– (মাল্‌ফুজাত, খঃ১, পৃঃ ১৯৫-১৯৬)।

(১৯)

'আঁহযরত সাল্লাল্লাহো ওয়া সাল্লামের পদচিহ্ন ধরে চলার জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, মানুষ খোদাতায়ালার প্রিয়পাত্র হয়ে যায়, তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এবং কেউ যদি পাপের বিষ ভক্ষণ করে থাকে, তাহলে তার সেই বিষের ক্রিয়া ভালবাসা এবং আনুগত্য এবং অনুবর্তিতার ঔষধ ও প্রতিষেধক দ্বারা নিরাময় হয়ে যায়। যেভাবে মানুষ ঔষধের দ্বারা আরোগ্য লাভ করে, তেমনিভাবে মানুষ পাপ থেকেও পবিত্র হয়ে যায়। এবং যেভাবে আলো অন্ধকারকে দুরীভূত করে, প্রতিষেধক বিষকে নষ্ট করে, আগুন বস্তুকে ভস্মীভূত করে; তেমনিভাবে প্রকৃত আনুগত্য এবং ভালবাসও কার্যকর হয়ে থাকে। দেখো, আগুন কী করে নিমেষেই সব জ্বালিয়ে দেয়। ঠিক সেভাবেই পূণ্যের তীব্র প্রেরণাও-যা শুধু খোদার গৌরব প্রকাশের নিমিত্তে নিয়োজিত হয়-তা আগুনের মতই পারের খড়ি-নড়িকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। যখনই কোনও ব্যক্তি পরিষ্কার মন নিয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান আনে এবং তাঁর মহিমা ও মর্যাদাকে স্বীকার করে এবং পূর্ণ সততা, সাধুতা, ভালবাসা ও আনুগত্য সহকারে তাঁর অনুসরণ করতে থাকে, এমনকি, পূর্ণ অনুবর্তিতার মাধ্যমে 'ফানা' বা বিলীন হওয়ার স্তরে পৌছে যায়-তখন সেই অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায় তাঁর (সাঃ) সঙ্গে-সেই সম্বন্ধের কারণে, এই ব্যক্তিও সেই ইলাহী নূর বা ঐশী আলোর কিরণ প্রাপ্ত হয় যা অবতীর্ণ হয় আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে। যেহেতু অন্ধকার এবং আলো একস্থিত হতে পারে না, সেহেতু তার অন্তরের অন্ধকারও তখন অপসৃত হতে থাকে। এমনকি, অবশেষে, সেই অন্ধকারের কোন অংশই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন সে আলো থেকে শক্তিলাভ করে এবং তার মধ্য থেকে উন্নত মর্যাদার পুণ্য কাজ সমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। এবং তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঐশীপ্রেমের আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তখন তার আভ্যন্তরীণ যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। তার জ্ঞান-বুদ্ধিতেও আলো পয়দা হয়, কাজে কর্মেও আলো পয়দা হয়। এবং উভয় আলোর সম্মিলনে পরিশেষে তার হৃদয় থেকে পাপজনিত অন্ধকার বিদূরিত হয়। এ সত্য তো সুস্পষ্টই যে, আলো এবং অন্ধকার একই স্থানে জমাট হতে পারে না। সুতরাং, ঈমানের আলো এবং পাপের অন্ধকারও

একই জায়গায় একস্থিত হতে পারে না। আর যদি এমন হয় যে, কোন ব্যক্তির কোনও পাপ প্রকাশ পায়নি, তাহলে, তার সেই আনুগত্যের কারণে এবং তার এই লাভ হবে যে, আগামীতে তার পাপ করবার ক্ষমতার বিলুপ্তিও ঘটে যাবে। এবং পূণ্য কাজ করবার আগ্রহ তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠবে। এদিকেই ইঙ্গিত করে কোরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

'আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা মনোরম করে দিয়েছেন, এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করে দেখিয়েছেন।' (৪৯ঃ৮)। – (রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স্, খ ১, নং ৫, পৃঃ ২০২)।

(২০)

'জেনে রাখা দরকার, মাহ্বুবিয়্যত, কবুলিয়্যত এবং বেলায়েতে হাক্কা অর্থাৎ খোদাতায়ালার কাছে প্রিয়ভাজন হওয়া, গৃহীত হওয়া, এবং তাঁর প্রকৃত বন্ধু হওয়ার যে স্তর, যার কিছু কিছু নিশান বা চিহ্নের বর্ণনা আমি দিয়ে এসেছি, তা আঁহযরত (সাঃ) এর আনুগত্য ছাড়া কোনমতেই লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই, আঁহযরত (সাঃ) এর কোন প্রকৃত আনুগত্যকারীর মোকাবেলায় কোন খৃষ্টান অথবা আর্য অথবা ইহুদী যদি খোদাতায়ালার কাছে কবুল বা গৃহীত হওয়ার কার্যকারিতার প্রমান এবং আলো দেখাতে চায়, তাহলে তার পক্ষে তা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। এবং তা পরীক্ষা করবার এটাই তো প্রকৃষ্ট পন্থা যে, যদি কোন সৎকর্মশীল মুসলমান, যে সত্যিকার অর্থেই মুসলমান এবং সত্যিকার অর্থেই নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারী, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনও খৃষ্টান বা অন্য কেউ খাড়া হয়ে যাক এবং এই দাবী করুক যে, যেভাবে তোমার জন্য আসমানী অর্থাৎ ঐশী নিদর্শন প্রদর্শিত হবে, যেভাবে গোপন রহস্যাবলী তোমার নিকটে প্রকাশিত হবে, যেভাবে প্রার্থনা মঞ্জুর করার মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করা হবে, যেভাবে কুদরত বা শক্তির নমুনা প্রদর্শন করে তোমার সম্মান ও মর্যাদা উন্নত করা হবে, যেভাবে বিশেষ বিশেষ পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকারসহ তোমার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হবে অথবা তোমার কোন অত্যাচারী বিরুদ্ধবাদীর উপরে কোন শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা হবে, সেভাবেই এ সমস্ত ক্ষেত্রেই, যা কিছু তোমার জন্যে প্রকাশিত হবে এবং যা কিছু তুমি প্রদর্শন করবে, তা সবই আমিও প্রদর্শন করবো। কিন্তু, এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কোন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষেই সম্ভব হবে না। সে কখনই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে না। কেননা, তার হৃদয় এই সাক্ষ্য বহন করে যে, সে মিথ্যাবাদী। সেই সত্য-খোদার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই, যে খোদা সাধুগণের সহায়তাকারী এবং বিশ্বস্তগণের বন্ধু।'

– (তসদীকুন্ নবী, পৃঃ ৪৫-৪৬)।

(২১)

'তৌহিদ বা খোদার একত্বে বিশ্বাসী হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে খোদার রসূলের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এতদুভরের মধ্যেকার সম্বন্ধ এমন যে, তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না। আর যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য ছাড়াই তৌহিদের দাবী করে তার কাছে আছে শুধু একটা শুষ্ক হাড্ডি, যার মধ্যে কোন মজ্জা বা মগজ নেই। এবং তার হাতে আছে শুধু

একটা মৃত প্রদীপ যাতে কোন আলো নেই। এছাড়া, এরূপ ব্যক্তি যে মনে করে যে, যদি কোন লোক খোদাকে এক ও অংশীবিহীন অর্থাৎ ওয়াহেদ ও লা-শরীক মানে, কিন্তু আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মানে না, তথাপি সে নাজাত বা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে; তাহলে নিশ্চয় জানবে যে ঐ ব্যক্তির হৃদয় কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত। সে অন্ধ। সে তৌহিদের কিছুই জানে না যে, তৌহিদ কি জিনিস। এবং তার এই ধরণের তৌহিদের ঘোষণায় শয়তানও তার চাইতে উত্তম। কেননা, শয়তান যদিও বা বিদ্রোহী এবং অবাধ্য, তবুও সে এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদা আছেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির তো আসলে খোদার প্রতি কোন বিশ্বাসই নেই।' – (হকীকাতুল ওহী,ঃ পৃঃ ১১৯)।

(২২)

'এখানে যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এই আজেয এবং মসীহ্-এর জন্যেও যদি এই স্তর সংরক্ষিত থাকে, তাহলে জনাবে সাইয়্যেদনা ও মওলানা, সাইয়্যেদুল কুল ও আফ্‌জালুর রুসূল, খাতামুন্নবীঈন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য আর কোন স্তর বাকী আছে? তাহলে, পরিষ্কার জেনে রাখা ভাল যে, সে এক অতীব উচ্চ স্তর ও মোকাম, এক অতিশয় উন্নত শান বা মর্যাদা, যা কিনা সেই গুণময় সত্তার মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। যার অনুধাবন করাই অপর কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তা অর্জন করা তো দূরের কথা . . . .(আল্লাহর) নৈকট্য এবং ভালবাসার স্তরসমূহ (মানুষের নিজের) আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত। সর্বাপেক্ষা নীচের যে স্তর-যদিও সেটাও অনেক উচ্চ- তাহচ্ছে, হৃদয় তখন ঐশী ভালবাসারর আগুনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং এমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে মনে হয় যেন, তার দ্বারা আগুন জ্বালাবার কাজ নেওয়া যাবে। কিন্তু তবু, তার মধ্যে তখন আগুনের উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয় না। এই স্তরের ভালবাসার উপরে যখন খোদাতায়ালার ভালবাসার রশ্মি পতিত হয়, তখন সেই রশ্মিপাত দ্বারা হৃদয়ে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তাকেই বর্ণনা করা হয়, কখনও পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি বা এতমিনান বলে, এবং কখনও বা তাকে অভিহিত (তার তাবির) করা হয় **ফেরেশতা** বলে।

দ্বিতীয় স্তরের ভালবাসা হচ্ছে এই যে, তখন উভয় প্রেমের মিলনের ফলে ঐশী প্রেমের আগুন মানব হৃদয়কে এত বেশী উত্তপ্ত করে তোলে যে, তা আগুনের মতই দীপ্তি মান হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই দীপ্তির মধ্যে কোন প্রকার দহনশক্তি থাকে না বা হল্কা সৃষ্টি হয় না। কেবল, দীপ্তিই সৃষ্টি হয়। তাকেই বলা হয় পবিত্র আত্মা বা **'রুহুল কুদ্দুস'**।

ভালবাসার তৃতীয় স্তর হচ্ছে, তখন ঐশী প্রেমের এক জ্বলন্ত শিখা মানবীয় প্রেমের উন্মুখ প্রদীপের উপরে পতিত হয় এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করে, এবং তাকে আপনার উত্তম ও পূর্ণ প্রকাশস্থলরূপে প্রস্তুত করে। এবং এই অবস্থায় ঐশী প্রেমের আগুন মানুষের হৃদয়কে শুধু দীপ্তিই দান করে না, বরং সেই দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার গোটা অস্তিত্বেই আগুন ধরিয়ে দেয়, এবং তার শিখাসমূহ চতুর্দিককে দিনের মতই আলোকিত করে তোলে, তখন আর আঁধারের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, এবং সমস্ত গুণাবলীসহ সারাটা অস্তিত্বই আগুনে আগুন হয়ে ওঠে। এই যে অবস্থা যা উভয় প্রেমের মিলনে প্রজ্জ্বলিত আগুনের রূপ ধারণ করে তাকেই **'রুহুল আমিন'** বা বিশ্বস্ত ও নিরাপদ আত্মা নামে অভিহিত করা হয়। কেননা, তখন তা প্রত্যেক অন্ধকার থেকে নিরাপত্তা লাভ

করে, এবং সকল প্রকারের অন্ধকার অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। তারই আর এক নাম **'শাদীদুল কাওয়া'** অর্থাৎ শক্তিশালী হৃদয়বৃত্তি, কেননা এ হচ্ছে অতি উন্নত স্তরের ক্ষমতা সম্পন্ন ওহী, যার চাইতে অধিক ক্ষমতাধর ওহীর কথা কল্পনাও করা যায় না। এবং তারই আর এক নাম হচ্ছে, **'যুল উফুকিল আ'লা'** অর্থাৎ অতি উচ্চ দিগন্ত, কেননা, এ হচ্ছে ওহী বা ঐশীবাণীর চরম ও অসীম প্রকাশ। এবং একে **'রা'আ মা রা'আ'** নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে, কেননা এই অবস্থার উপলব্ধি ও অনুধাবন সমগ্র সৃষ্টির চিন্তা, ধ্যান এবং কল্পনারও অতীত এবং এই অবস্থা পৃথিবীর বুকে প্রাপ্ত হয়েছেন মাত্র একজন মানুষ, যিনি পরিপূর্ণ মানব বা ইনসানে কামেল, যাঁর মধ্যে গিয়ে মানবীয়তা ও মানবিকতার সমস্ত প্রবাহ অর্থাৎ সিলসিলায়ে ইনসানিয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে, এবং মানবীয় যোগ্যতাবলীর বৃত্ত চূড়ান্তরূপে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তিনিই, প্রকৃত অর্থেই আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির ক্রমোন্নতির রেখার শীর্ষ বিন্দু, যে বিন্দু উন্নতির স্তর সমূহের উর্দ্ধে সর্বশেষ স্তর। ঐশী প্রজ্ঞার হস্ত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র এবং সামান্য থেকে সামান্য সৃষ্টি থেকে শুরু করে সৃষ্টির ক্রমধারাকে ঐ সর্বোন্নত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। যার নাম, অন্য কথায় **'মুহাম্মদ'**- (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম)- যার অর্থ হচ্ছে, অতিশয় প্রশংসা করা হয়েছে, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম গুণাবলীর প্রকাশস্থল। অতএব, প্রকৃতি বা স্বভাবের দিক থেকে সেই নবীর মোকাম যেমন সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত, তেমনি বাহ্যিক দিক থেকেও তাঁকে দান করা করা হয়েছে সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত স্তরের ওহী বা ঐশীবাণী। এবং তিনি ভালবাসারও সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত মোকাম বা স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন। ইহাই সেই উচ্চ মোকাম যেখানে না আমি পৌঁছতে পারি, না মসীহ্। এই মোকামের নাম হচ্ছে-**'মোকামে জমা'** এবং **'মোকামে ওয়াহদাতে তাম্মা'**-অর্থাৎ একস্থিত হওয়ার মোকাম এবং পূর্ণ ঐক্যের বা পূর্ণরূপে একীভূত হওয়ার মোকাম। পূর্ববর্তী নবীগণ, যাঁরা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের খবর দিয়েছিলেন, তাঁরা এরই সূত্র ধরে এবং এরই নিদর্শনের উপরে খবর দিয়েছিলেন এবং এই মোকামের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। যেমন, মসীহ এবং এই আজেযের (অর্থাৎ আমার) মোকাম এরূপ যে, তাকে রূপকের ভাষায় বলা যায় 'পুত্রত্ব'। তেমনিভাবে, সেই যে সর্বোন্নত মোকাম, অতীতের নবীগণ রূপকভাবে, সেই মোকামের অধিকারীর আবির্ভাবকে খোদাতায়ালার আবির্ভাব বলে অভিহিত করেছেন; এবং তাঁর আগমনকে খোদা – তায়ালার আগমন বলে নির্দেশ করেছেন।' –(তৌজিহ মারাম, পৃঃ ১৩-১৫)।

(২৩)

'আমাদের নেতা ও প্রভু জনাবে মুকাদ্দস খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) সম্পর্কে শুধু মসীহ (আঃ)ই বর্ণনা করেননি যে, দুনিয়াতে আঁযরত (সাঃ) এর আগমন যেন খোদাতায়ালারই প্রকাশিত হওয়া। বরং একই ধরণের কথা বলেছেন, অন্যান্য নবীগণও আঁহযরত (সাঃ)–সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনাতে। এবং তাঁরা রূপকভাবে আঁহরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবকে খোদাতায়ালার আবির্ভাব বলে অভিহিত করেছেন। বরং, খোদাতায়ালার সর্বোত্তম প্রকাশস্থল হওয়ার কারণে আঁহযরত (সাঃ)কে তাঁরা খোদা বলেই উল্লেখ করেছেন। তাই, হযরত দাউদ (আঃ) এর 'যবুর' এর মধ্যে লিখিত আছেঃ

'তুমি আদম সন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর; তোমার
ওষ্ঠাধরে নেয়ামত বর্ষিত হয়; এই জন্য খোদা তোমাকে
চিরকালের জন্য মোবারক বা আশিসমণ্ডিত করেছেন;
(অর্থাৎ তোমাকে খাতামুল আম্বিয়া করা হয়েছে)ঃ
হে বীর তুমি তোমার তরবারি কটিদেশে বন্ধন কর;
তোমার গৌরব ও তোমার প্রতাপসহ ; আর স্বীয় প্রতাপে
কৃতকার্য হও, বাহনে সওয়ার হয়ে যাও সত্য, ধার্মিকতা
ও নম্রতার পক্ষে; তোমার ডান হাত তোমাকে ভয়াবহ
কাজ শিখাবে তোমার বানসকল সুতীক্ষ্ণ; জাতিরা
তোমার তলে পতিত হয়; রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হয়;
হে খোদা! তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী; তোমার
রাজদণ্ড সরলতা ও সাধুতার দণ্ড ; তুমি ধার্মিকতাকে
ভালবাস এবং দুষ্টতাকে ঘৃণা কর; এই কারণে, খোদা,
তোমার খোদা, তোমাকে অভিষিক্ত করেছেন তোমার
সঙ্গীগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দ তৈলে। – (গীতসংহিতাঃ ৪৫ঃ ২-৭)।

এখানে, জানা দরকার যে, জব্বুর বা গীত সংহিতার এই যে কথাঃ 'হে খোদা! তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী; তোমার রাজদণ্ড সরলতা ও সাধুতার দণ্ড..'-তা রূপকভাবে বলা হয়েছে। এবং উদ্দেশ্যে হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহিমাকে প্রকাশ করা।

ইসাইয়াহ নবীর কোতাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ ঐ দেখ, আমার বান্দা, আমি তাঁকে ধারণ করি, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁতে প্রীত, আমি তাঁর উপরে আমার আত্মাকে স্থাপন করেছি, তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায় বিচার উপস্থিত করবেন। তিনি চীৎকার করবেন না, পথে আপন রব শোনাবেন না। তিনি থেৎলা নল ভাংবেন না, সধূম শলিতা নির্বান করবেন না, সত্যে তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করবেন। তিনি নিস্তেজ হবেন না, নিরুৎসাহ হবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায় বিচার স্থাপন করেন; আর উপকূল সমূহ তাঁর শরীয়তের অপেক্ষায় থাকবে। . . . . **সদাপ্রভু (খোদাওন্দ খোদা) বীরের ন্যায় যাত্রা করবেন,** তিনি যোদ্ধার ন্যায় আপন আত্মাভিমানকে উত্তেজিত করবেন . . . । – (যিশাইয়-৪২ঃ১-৪; ১৩)।

এই যে, বলা হয়েছে, খেদাওদ খোদা বা সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করবেন..' এখানেও রূপকভাবে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতাপপূর্ণ আবির্ভাবের কথাই বলা হয়েছে। আরও অনেক নবী তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনুরূপ রূপকের ব্যবহার করেছেন।'

–(তৌজিহ মারাম, পৃঃ ১৭-১৯, পাদটীকা)।

(২৪)

'ধর্মীয় সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে নাজাত এবং শাফায়াত (পরিত্রাণ এবং মধ্যস্থতা)-এর প্রশ্নটি খুবই বড় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ধর্ম পালনের গোটা উদ্দেশ্যটাই শেষ হয়েছে

এখানে এসেই। কোন ধর্ম সত্য এবং সঠিক কিনা তা পরখ করে দেখবার পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এটাই এবং এর মাধ্যমেই পূর্ণ সন্তুষ্টি ও স্বস্তির সঙ্গে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, অমুক ধর্ম প্রকৃত প্রস্তাবেই সত্য ধর্ম এবং তা খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে আগত। এবং একথা সম্পূর্ণ সঠিক ও খাঁটি যে, যে ধর্ম এই বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথভাবে বর্ণনা দান করেনি কিংবা তার অনুসরণকারীদের মধ্য থেকে পরিত্রাণ বা নাজাত প্রাপ্ত লোকদের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যসহ পেশ করতে পারেনি, ধরে নিতে হবে যে, সেই ধর্ম বাতিল বা মিথ্যা এবং তার মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আর কোন প্রমাণের দরকার নেই। পক্ষান্তরে, যে ধর্ম নাজাতের প্রকৃত স্বরূপ বা আসল হকীকত পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেছে, এবং শুধু প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং বর্তমান যামানায়ও এরূপ লোকের দৃষ্টান্তও পেশ করেছে যার মধ্যে পূর্ণরূপে নাজাতের রূহ ও পরিত্রাণের আত্মা ফুৎকার করে দেওয়া হয়েছে, সেই ধর্ম মোহরাঙ্কিত হয়েছে যে, তা সত্য ধর্ম এবং তা খোদাতায়ালার কাছ থেকে আগত।

এতো জানা কথাই যে, প্রতিটি মানুষ স্বভাবতঃই মনে মনে অনুভব করে যে, তার জীবনের চলাপথে শত শত গাফলতি ও অনীহা, প্রবৃত্তির তাড়না, ইতঃস্ততা, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা, পদে পদে অন্ধকার ও বিপত্তি এবং অহোরহ ভীতি ও সংশয় প্রভৃতির কারণে, এবং সেই সঙ্গে নানা প্রকারের পার্থিব আপদ বিপদ ও বালা-মুসিবত ইত্যাদির দরুন তার এমন একটি হাতর দরকার যে হাত তাকে ঐ সমস্ত অশুভ এ অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে বাঁচাবে। কেননা, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল। সে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের উপর এমন ভরসা করতে পারে না যে, সে নিজে নিজেই তার অহম ও প্রবৃত্তির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। মানুষের বিবেকই এর সাক্ষী। এছাড়া, যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, তাহলে সুস্থবুদ্ধি এটাই বলবে যে, নাজাতের জন্য শাফী বা মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন আছে। কেননা, খোদাতা'লার অবস্থানতো সর্বোচ্চ স্তরে পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতারও উর্ধ্বে। অপরদিকে মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে ও পাপ-পঙ্কিলতার গহ্বরে নিপতিত। কোন সম্পর্ক এবং সাদৃশ্য না থাকার দরুন, সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে প্রায় কারোই এইরূপ যোগ্যতা নেই যে, সে সরাসরি খোদাতায়ালার কৃপা লাভ করে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। অতএব, আল্লাহতায়ালার হেকমত ও রহমত বা প্রজ্ঞা ও দয়া এটাই চেয়েছিল যে, মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে এমন কিছু কামেল ব্যক্তি যারা নিজেদের স্বভাবের মধ্যে এক বিশেষ ফজিলত রাখে, তারা মধ্যস্থতা করুক। এবং তারা এই ধরণের মানুষ হোক যাদের স্বভাব বা ফিৎরত লাহুতী বা পারত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করেছে এবং কিছু অংশ নাছুতী বা ঐহিক বৈশিষ্ট্য থেকে গ্রহণ করেছে। যাতে করে তারা তাদের লাহুতী বৈশিষ্ট্যের দরুণ খোদাতায়ালার কাছ থেকে ফয়েয বা আশিস লাভ করতে পারে এবং তাদের নাছুতী বৈশিষ্ট্যের দরুণ সেই ফয়েজ, যা তারা উর্ধলোক থেকে লাভ করেছে তা নিম্নলোকে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাতে পারে। এবং এই কথা বলা অবশ্যই যথার্থ যে, এই শ্রেণীর মানুষ, যারা লাহুতী ও নাছুতী বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতা লাভ করে, তারা অপরাপর মানুষের মধ্যে এক প্রকার বিশেষ ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়। বলতে কি, তাঁরা যেন এক শ্রেণীর স্বতন্ত্র সৃষ্টি। কেননা, এই শ্রেণীর লোকদেরকে খোদাতায়ালার গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করবার যত বেশী প্রবল প্রেরণা দান করা হয়, এবং তাদের হৃদয়কে যতবেশী বিশ্বস্ততা দিয়ে ভরপুর করা হয়,

এবং মানুষের জন্য সহানুভূতির যে পরিমাণ প্রেরণা তাদেরকে দান করা হয়, তা এমন এক অসাধারণ বিষয় যে, তার কল্পনা করাও অপরের পক্ষে দুষ্কর। অবশ্য, একথাও মনে রাখা দরকার যে, এই সকল লোকের স্তর বা মর্তবা এক সমান নয়। কেউ কেউ স্বভাবগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অন্যদের চাইতে উপরের স্তরের, কেউ বা তার নীচের এবং কেউ বা আরও নিম্নস্তরের। সুস্থ বুদ্ধির যে কোন মানুষের পবিত্র বিবেক একথা বুঝতে পারে যে, শাফায়াত বা মধ্যস্ততা করার বিষয়টা কোনও বানোয়াটি ব্যাপারও নয়, অসত্যও নয়। বরং খোদা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থার মধ্যেই এর দৃষ্টান্ত নিহিত রয়েছে। এবং প্রকৃতির বিধানের মধ্যেই রয়েছে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ। শাফায়াত-এর ফিলসফী বুঝতে হলে, জানা দরকার যে, মধ্যস্থ বা 'শাফ্আ'- শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'জোড়া'। অতএব 'শাফায়াত' শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, শাফী বা মধ্যস্থতাকারীর গুণাবলীর মধ্যে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তা হচ্ছে, তাকে উভয় তরফেই সম্পর্ক রাখতে হবে। অর্থাৎ একদিকে খোদাতায়ালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে তার আত্মার, এমনকি মনে হবে যে, নিবিড় মিলনের ফলে সে যেন ঐশী সত্তার জোড়া হয়ে গেছে এবং তারই সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে, সৃষ্টির (মানুষের) সঙ্গেও তার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে যে, মনে হবে সে যেন মানুষের দেহের এক অঙ্গই হয়ে গেছে। সুতরাং 'শাফায়াত' কার্যকর হতে হলে, এর এই উভয় অংশেরই একান্ত প্রয়োজন।

এটাই সেই রহস্য যে কারণে, ঐশী প্রজ্ঞা অর্থাৎ ইলাহী হেকমত আদমকে (আঃ) এমনভাবে বানিয়েছিলেন যে, একেবারে শুরু থেকেই তাঁর স্বভাবের মধ্যে এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অর্থাৎ এক সম্পর্ক তো তিনি খোদার সঙ্গে কায়েম করেছিলেম, যেমন কিনা কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

'অতঃপর, যখন আমি তার গঠনকার্য সুসম্পন্ন করি, এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুৎকার করি, তখন তোমরা (হে ফেরেশতারা) তার (আনুগত্যের) জন্য সিজদায় পড়ে যাও।' (১৫ঃ৩০)।

এই আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা আদমকে সৃষ্টি করার সাথে সাথেই তাঁর মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুৎকার করে দিয়ে তাঁর স্বভাবের সঙ্গে নিজের একটা সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছেন। এবং এটা এজন্যই করা হয়েছে, যেন স্বভাবগতভাবেই মানুষের সঙ্গে খোদার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। তেমনিভাবে অপরদিকে, এটাও প্রয়োজন ছিল যে, সেই সকল লোক, যারা নিজেরদেরকে মনুষ্য সন্তান বলে পরিচয় দেয়, তাদের সঙ্গেও স্বভাবত একটা সম্পর্ক যেন সৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা, তাদের দেহ যখন আদমের হাড্ডি থেকে হাড্ডি এবং গোশ্ত থেকে গোশ্ত নিয়ে গঠিত, তখন তারা অবশ্যই সেই রূহ থেকেও অংশ গ্রহণ করবে, যা আদমের মধ্যে ফুৎকার করে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, এ কারণেই আদম স্বভাবগতভাবেই তাদের 'শাফী' বা মধ্যস্থতাকারী হয়েছেন। কেননা ফুৎকার করে দেওয়ার দরুন, যে সাধুতা আদমের প্রকৃতিতে দান করা হয়েছে, অবশ্য অবশ্যই সেই সাধুতা থেকে কিছু না কিছু হিস্যা ঐ সমস্ত লোকেরাও পেয়ে যাবে যাদের উদ্ভব ঘটেছে তাঁর থেকেই। যেমন, এটা

তো জানা কথাই যে, প্রত্যেক প্রকারের প্রাণীর বাচ্চা সেই প্রাণীর গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপ থেকেই অংশগ্রহণ করে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, শাফায়াত-এর হকীকত বা গূঢ়তত্ত্ব এটাই যে, স্বভাবের অংশীদার আপনাপন অংশদাতার কাছ থেকে আপন হিস্যা গ্রহণ করবে। এজন্যই, আমি বর্ণনা করে এসেছি যে, শাফায়াত শব্দটি 'শাফআ শব্দ থেকে এসেছে। যার এক অর্থ জোড়া বা সাথী। সুতরাং কোন ব্যক্তি, স্বভাবগত কারণে, অপর এক ব্যক্তির জোড়া হয়ে গেলে, সে অপর ব্যক্তির গুণাবলী থেকেও অংশগ্রহণ করবে।

এই মূলনীতির উপরে ভিত্তি করেই গুণাবলীর উত্তরাধিকারের গোটা শৃঙ্খলাটাই জারি রয়েছে। মানব-শিশু মানবীয় গুণাবলী লাভ করে, অশ্ব-শাবক অশ্বের গুণাবলী লাভ করে। এবং এই উত্তরধিকার, অন্য কথায়, শাফায়াত বা মধ্যস্থতা থেকে লাভবান হয়। কেননা, শাফায়াতের মূল যেহেতু শাফ্অ বা জোড়া; সেহেতু যে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় লাভবান হতে চায়, তাকে অবশ্যই সেই অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যাতে করে সে সেই অপর ব্যক্তির প্রকৃতিতে যা দান করা হয়েছে তা থেকে তার প্রকৃতিও কিছু অংশ পেয়ে যায়। এই সম্পর্ক যেমন মানব প্রকৃতিতে প্রদত্ত দান হিসেবে বিদ্যমান থাকে যে, একজন অপর একজন মানুষের জোড়া, তেমনি এই সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায় অর্জন করার মাধ্যমেও। অর্থাৎ, যখন কোন মানুষ এই আকাঙ্খা করে যে, তার মধ্যে মানবজাতির জন্য যে স্বভাবগত ভালবাসা এবং স্বভাবগত সহানুভূতি রয়েছে, তা আরও বৃদ্ধিলাভ করুক, তখন তা তার স্বভাবের বৃত্তের পরিধির অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনিভাবেই, এক ব্যক্তির প্রতি আর এক ব্যক্তির যে প্রেম, সেই প্রেমের মধ্যেও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এবং এমন অবস্থায় সৃষ্টি হয় যে, তাকে না দেখলে সে আর কোনমতেই শান্তি পায় না। অবশেষে, তার গভীর ভালবাসা ঐ ব্যক্তির হৃদয়ের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে ; এবং যে ব্যক্তি অপর কাউকে চরমভাবে ভালবাসে, সে ব্যক্তি তার সেই ভালবাসার ব্যক্তির কল্যাণও সত্যিকারভাবে এবং চরমভাবেই কামনা করে। বিষয়টি শিশুদের বেলায় সপ্রমাণিত ও সহজবোধ্য।

অতএব, ভালবাসাই হলো শাফায়াতের মূল শিকড়, অবশ্য যখন এর সাথে যুক্ত থাকে স্বভাবজ সম্পর্ক। কেননা, স্বভাবজ সম্পর্ক ছাড়া ভালবাসার পূর্ণতা, যা কিনা শাফায়াতের শর্ত, তা সম্ভব নয়। এই সম্পর্ককে মানবীয় স্বভাবের ভেতরে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই 'হাওয়া'কে পৃথকভাবে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং তাঁকে আদম-এর পাঁজরের হাড্ডি থেকেই পয়দা করা হয়েছে। যেমন, কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا 'এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন।' (৪ঃ২)। অর্থাৎ, আদমের সত্তা থেকেই আমরা তার জোড়া পয়দা করেছি, যার নাম 'হাওয়া' যাতে করে আদমের যে সম্পর্ক হাওয়া এবং তাঁর সন্তানদের সঙ্গে তা যেন স্বভাবগত হয়, বানোয়াটি না হয়। এটা এজন্যই করা হয়েছে যে, এতে করে যেন, আদম সন্তানদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও সহানুভূতি স্থায়ী হয়। কেননা, স্বভাবগত সম্পর্ক হয় অকৃত্রিম ও স্থায়ী। পক্ষান্তরে, যে সম্পর্ক স্বভাবগত নয়, তা স্থায়ী হয় না। কেননা, এর মধ্যে সেই স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে না, যা থাকে স্বভাবজ সম্পর্কের মধ্যে। কাজেই, খোদাতায়ালা

আদমের মধ্যে স্বভাবগতভাবেই এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন' যা একদিকে খোদার সঙ্গে এবং অপরদিকে মানব জাতির জন্য প্রয়োজন ছিল।

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে যে, শাফী বা মধ্যস্থকারী হওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তিনিই, যিনি হবেন কামেল ইনসান অর্থাৎ পূর্ণ মানব। তিনি এই উভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেই পূর্ণতায় পৌঁছে যাবেন। এবং এই উভয় প্রকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ণতায় না পৌছা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানব হতে পারবে না। এজন্যই আদমের পরেও আল্লাহর নিয়ম বা সুন্নতুল্লাহ এভাবেই জারী হয়ে এসেছে যে, কামেল ইনসান-যে শাফী হতে পারে-তার জন্য এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ, এক সম্পর্ক এই যে, তার মধ্যে আসমানী রূহ ফুৎকার করে দেওয়া হয়, এবং খোদা তার সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হন যে, মনে হয় যেন তার উপরে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং দ্বিতীয় সম্পর্ক হচ্ছে, মানুষের মধ্যেকার পরস্পর জোড়া হওয়ার সম্পর্ক, যা হাওয়া এবং আদমের মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক সহানুভূতি ও ভালবাসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, এবং যা তাঁদের মধ্যে সব চাইতে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। এবং এটাই সেই প্রেরণা, যার দরুণ, সব মানুষের প্রতি তাদের স্ত্রীরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এবং এ ব্যাপারে একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির প্রেরণা বিদ্যমান থাকে। এবং এদিকে সেই হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার মধ্যে বলা হয়েছে ঃ 'খায়রোকুম খায়রোকুম লে আহ্‌লেহি''

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই মানবজাতির সর্বাপেক্ষা বেশী কল্যাণ সাধন করতে পারে, যে প্রথমে তার নিজের স্ত্রীর কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু, যে ব্যক্তি তার নিজের স্ত্রীর প্রতি জুলুম ও দুর্ব্যবহার করে, তার পক্ষে এটা সম্ভবই নয় যে, সে অপরের কোন কল্যাণ সাধন করে। কেননা, খোদা আদমকে সৃষ্টি করার পর সর্বপ্রথম তার স্ত্রীকেই তার ভালবাসার পাত্র বানিয়েছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিংবা যার কোন স্ত্রীই নেই, সে কামেল ইনসান হওয়ার স্তর থেকে নীচে পড়ে গেছে। এবং সে শাফায়াতের দুই শর্তের একটি থেকে বঞ্চিত। এজন্য, যদি সে নিস্পাপও হয়, তবু সে শাফায়াত করার যোগ্য বলে বিবেচিত হনে না। কিন্তু, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, সে নিজের জন্য মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির বুনিয়াদ স্থাপন করে। কেননা, একজন স্ত্রীই বহুজনের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণ হয়ে যায়। এবং সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদেরও বিয়ে-শাদী হয়। ছেলে মেয়েদের নানী, মামা ইত্যাদি নানা রকমের সম্বন্ধ হয়। এবং এভাবেই এক ব্যক্তি বহুজনের সঙ্গে ভালবাসা ও সহানুভূতি-সহমর্মিতায় জড়িত হয়ে পড়ে। এবং ভালবাসা ও সহানুভূতিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এবং তার এই অভ্যাসের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সকলকেই আপন সহানুভূতির অংশ দিতে থাকে। কিন্তু যে সকল লোক যোগীদের ন্যায় লালিত পালিত হয় বা জীবন যাপন করে তারা এই অভ্যাসকে বৃদ্ধি করবার কোনও মওকাই পায় না। ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, এবং শুষ্ক হয়ে যায়।

এটা সুস্পষ্ট যে, নিস্পাপ হওয়ার বা পাপ-শূন্যতার সঙ্গে শাফায়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, পাপশূন্য বা নিস্পাপ হওয়ার সীমা শুধু এতটুকুই যে, মানুষ পাপ থেকে বেঁচে থাকবে। পক্ষান্তরে, পাপের সংজ্ঞা হচ্ছে, খোদার হুকুমকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে লংঘন

করে শাস্তি লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, পাপ শূন্যতা বা আসমত ও শাফায়াতের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। এ কারণেই, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এবং জন্মগতভাবে হাবাগোবা বা নির্বোধ প্রতিবন্ধীরা নিষ্পাপ। কেননা, তারা স্বেচ্ছাকৃত কোন পাপ করতে পারে না। অন্যথায়, তারা তাদের কোন অনুরূপ কাজের জন্য খোদাতায়ালার কাছে পাপী বলে সাব্যস্ত হতো। সুতরাং, তারা নিঃসন্দেহে এই অধিকার রাখে যে, তাদেরকে নিষ্পাপ বলেই গণ্য করা হবে। কিন্তু তারা কি এই অধিকারও রাখে যে, তারা মানুষের জন্য শাফী ও মধ্যস্থতাকারী হবে? অতএব, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, মধ্যস্থ হওয়া এবং নিষ্পাপ বা মাসুম হওয়ার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। . . . .

'শাফী' ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন, যেভাবে আমি বর্ণনা করে এসেছি যে, খোদার সঙ্গে তাঁর এমন এক গভীর সম্পর্ক থাকবে যে, যেন খোদা তাঁর হৃদয়ের উপরে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁর গোটা মানবত্ব বা ইনসানিয়াত যেন মরে গিয়ে তাঁর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে 'লাহুতী তজল্লী' বা আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হয়। এবং তাঁর আত্মা বিগলিত হয়ে পানির ন্যায় খোদাতায়ালার দিকে প্রবাহিত হয় এবং এভাবে নৈকট্যের চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে উপনীত হয়। এবং এমনিভাবে, শাফী ব্যক্তির জন্য এটাও জরুরী যে, যার জন্যে তিনি শাফায়াত করতে চান, তার প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর কলিজা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, এবং তীব্র উৎকণ্ঠায় তাঁর অবস্থা এমন হবে যে, মনে হবে যেন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ছিঁড়ে-ছুটে যাচ্ছে এবং তাঁর অনুভূতিগুলিও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর সহানুভূতি বা হামদর্দী ঐ ব্যক্তিকে এমন অবস্থানে বা মকামে পৌঁছে দেবে যা তার পিতার চাইতেও উন্নততর মাতার চাইতেও উন্নততর এবং দুঃখ-বেদনায় তার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রত্যেক ব্যক্তির চাইতে উর্ধ্বে। সুতরাং, যখন এ উভয় অবস্থাই তাঁর মধ্যে পয়দা হয়ে যাবে, তখন তাঁর অবস্থা এরূপ হয়ে যাবে যে, যেন তিনি একদিকে আসমান বা লাহুত– এর মকামের জোড়া হয়ে যান, অপরদিকে, পার্থিব বা নাছুত-এর মকামের জোড়া হয়ে যান। তখন তাঁর মধ্যে দাঁড়ি-পাল্লার উভয় পাল্লা বরাবর হয়ে যায় অর্থাৎ তখন তিনি কামেল লাহুত-এর প্রকাশক হবেন এবং কামেল নাছুত-এরও প্রকাশক হবেন, এবং এতদুভয়ের মাঝখানে হবে তাঁর অবস্থান।

এভাবেই, এই মকামে শাফায়াতের প্রতি ইংগিত করে আঁহযরত সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ মানব বা ইনসানে কামেল হওয়ার শান বা মর্যাদা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ

'সে (মুহাম্মদ-সাঃ আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও (মুহাম্মদ সাঃ-এর প্রতি) নিম্নে অবতরণ করলেন। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক ছিলা (তন্ত্রী) হয়ে গেল, অথবা তা থেকেও ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল।' (৫৩ঃ৯,১০)।

অর্থাৎ রসূল (সাঃ) খোদার দিকে উঠলেন এবং যতদূর সম্ভব খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছলেন এবং নৈকট্যের সমস্ত সম্পূর্ণতা বা কামালত অর্জন করলেন এবং আসমানী বা লাহুতী মকাম থেকে সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেন। এবং পুনরায় পার্থিব বা নাছুতী মকামের দিকে পূর্ণরূপে রুজু করলেন বা ঝুঁকে গেলেন। অর্থাৎ উবুদিয়াত বা সেবা–উপাসনার চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নিজেকে উপনীত করলেন। এবং বাশারিয়াত বা মানবীয়তার পবিত্র গুণাবলী অর্থাৎ মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা-যা কিনা নাছুতী কামাল বা পার্থিব পরিপূর্ণতা-তা থেকে সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেন। অতএব, একদিকে খোদার মহব্বতে এবং অপরদিকে মানুষের মহব্বতে একেবারে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গেলেন। যেহেতু, তিনি সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে খোদার নৈকট্যে পৌঁছে গিয়ে পুনরায় অনুরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মানুষের কাছেও ফিরে এসেছিলেন, সেহেতু উভয় পক্ষের সান্নিধ্যে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দরুন এরূপ হয়ে গিয়েছিলেন যে, দুইটি ধনুকের মুখোমুখি একটি মাত্র ছিলা বা গুণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং, শাফায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় যে শর্ত, তা তাঁর মধ্যে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবং খোদাতায়ালাও তাঁর কালামে তাঁর (সাঃ) জন্য এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর মানজাতির জন্য এবং আপন খোদার জন্য এমন এক মধ্যস্থ হলেন যে, দুই ধনুকের মাঝে একছিলা হয়ে গেলেন।

পুনরায় অন্য এক মকামেও তাঁর ইলাহী বা ঐশী সান্নিধ্যের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

('তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কোরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছু আল্লাহর জন্যে যিনি জগত সমূহের প্রভূ প্রতিপালক।'-৬ঃ১৬৩)।

অর্থাৎ, লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমার অবস্থাতো এই যে, আমি আমার সত্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছি এবং আমার সমস্ত এবাদত খোদার জন্য হয়ে গেছে..... এই আয়াত বলে দিচ্ছে যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমনভাবে খোদার মধ্যে গুম এবং এমনভাবে লীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস এবং তাঁর মৃত্যু একমাত্র খোদাতায়ালার জন্যই হয়ে গিয়েছিল। এবং তাঁর সত্তায় অহম এবং সৃষ্টি এবং উপায়–উপকরণের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এবং তাঁর আত্মা খোদাতায়ালার আস্তানায় এরূপ সততার সঙ্গে সিজদায় পড়ে রয়েছিল যে, তার মধ্যে অন্য আর কিছুর লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

এবং যেহেতু, খোদার সাথে মহব্বত করা, এবং তাঁর মহব্বতে সর্বাপেক্ষা নিবিড় সান্নিধ্যে পৌঁছে যাওয়া এমন একটি বিষয় যা অপর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু খোদাতায়ালা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর এমন সব কার্যাবলী প্রকাশিত করেছেন, যদ্বারা প্রমানিত হয় যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে খোদাকেই গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর শিরা-উপশিরায়, তাঁর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে খোদার মহব্বত এবং খোদার মহিমা

এমনভাবে মিশে গিয়েছিলো যে, তাঁর সত্তা খোদার খোদায়ী বা তজল্লীয়াত দেখবার আয়নায় পরিণত হয়েছিল। খোদার প্রতি পূর্ণ ভালবাসার প্রভাব ও কার্যকারিতা যতদূর কল্পনা করা সম্ভব তার সমস্তটা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। –(রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স, উর্দু, খ. ১, পৃঃ ১৭৫-১৮৭)।

(২৫)

বোঝা দরকার যে, তিনি (খোদা) তাঁর মত কোন খোদা সৃষ্টি করেন না, কেননা তাঁর একত্ব, তার অনন্য ও অনুপম গুণাবলী যা আদি, অন্ত ও চিরন্তনরূপে তাঁর মধ্যে বিরাজমান তা তাঁকে এদিকে মনোযোগ দিতে বাধা দেয় . . . .

তবে হ্যাঁ, তিনি একভাবে তাঁর অনন্য ও অনুপম সত্তার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে থাকেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তার সত্তার গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটান, যা প্রকৃত অর্থে কেবল তাঁরই আয়ত্তাধীন। এবং তাঁর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর (সেই দৃষ্টান্তের) মধ্য দিয়ে তিনি সেই সব গুণাবলীকে--যেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর নিজেরই-সেগুলিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পূর্ণতা দান করেন প্রতিবিম্বের আকারে।

এবং এদিকেই ইঙ্গিত করে কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ 'এবং তাদের মধ্যে কাউ কাউকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন' ২ঃ২৫০। এস্থলে, উন্নত মর্যাদার স্তরসমূহের অধিকারী বলতে বোঝানো হয়েছে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে। তাঁকে যিল্লীরূপে অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আকারে ঐশী গুণাবলীর পূর্ণতা দান করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত আকারেই দান করা হয়েছে। এবং সেই যে আসল খেলাফত, যার সত্তার পূর্ণতা সত্যায়ন করার জন্য মানব জাতির ধারাবাহিকতা বা 'সিলসিলায়ে আদম'কে খাড়া করা হয়েছে, বরং সমগ্র সৃষ্টিকেই অস্তিত্ব দান করা হয়েছে, তা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তায় ও অস্তিত্বে আপন মর্যাদায় সর্বোত্তমরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে খোদা-দর্শনের আয়নায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই বিতর্ক ঐশী তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাতের মধ্যে একটি অতিশয় সূক্ষ্ম বিতর্ক। এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা, যাঁরা এ নাজুক সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন, এবং সেই উলুহিয়াতের (ঐশী) রহস্যাবলীর সঙ্গে যাঁদের কোন পরিচয় নেই, তাঁরা আশ্চর্য হবেন যে, কী করে, কোটি কোটি অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে থেকে মাত্র একজন মানুষই পূর্ণ ও প্রকৃত খেলাফত, যা কিনা উলুহিয়াতের মর্তবার যিল্ল বা খোদায়ীর মর্যাদার প্রতিচ্ছবি, তা অর্জন করলো! যদিও, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তবু সত্যান্বেষীর কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য এতটুকু বলা প্রয়োজন যে, আল্লাহর রীতি বা বলতে পারেন যে, প্রাকৃতিক বিধান, যা কিনা তাঁর একত্ব-এর গুণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা এই যে, তিনি এক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একত্বের বিষয়টিকেও সমুন্নত ও সঠিক রাখেন। যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন, আমরা যদি তার সব কিছুর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সারাটা সৃষ্টিকে, যা সেই কুদরতের হস্ত দ্বারা নির্মীত হয়েছে, তার একত্বের ধারা বা সিলসিলা তার এমন এক সরল রেখার ন্যায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসমন্বিত যে, যার এক মাথা উর্ধ্বে উন্নত এবং অপর মাথা নিম্নে নিমজ্জিত----উর্ধমুখী শীর্ষ বিন্দুতে রয়েছে এক মানুষ, যিনি মানবীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতাসমূহে অন্য সমস্ত

মানুষ থেকে অধিক ক্ষমতাধর ও যোগ্যতর। অপরদিকে, সর্বনিম্ন বিন্দুতে সেই আত্মার অবস্থান যার ক্ষমতা ও যোগ্যতাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং চরম ক্ষতির কারণে বিবেকবুদ্ধিহীন পশুতুল্য হয়েছে। আমরা যদি বস্তু জগতের সৃষ্টির ক্রমবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে, আমরা এই প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট সমর্থন দেখতে পাব। কেননা, খোদাতায়ালা ছোট থেকে ছোট কণা, যা এক পরমাণুর সমান, তা থেকে শুরু করে বড় থেকে বড় বস্তু, যেমন সূর্য নক্ষত্র পর্যন্ত সৃষ্টি করেছেন। এবং আপনার স্রষ্টা-গুণের পূর্ণতা সাধন করেছেন। এবং সন্দেহ নেই, এই সৌর জগতের সৃষ্টি ধারায় খোদা'তালা সূর্যকে একটি মহান, উপকারী এবং কল্যাণমণ্ডিত অস্তিত্বরূপে সৃষ্টি করেছেন, এবং উর্ধ্ব সীমান্তে এর সমকক্ষ আর কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এই সৃজন বিন্যাসের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বিন্দুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টির সামনেই আছে, আমরা বুঝতে পারি যে, আধ্যাত্মিক সৃজন বিন্যাস যা ঐ হস্ত থেকেই নির্গত হয়েছে, তাও একইভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসমন্বিত। এর মধ্যেও আছে অনুরূপ উচ্চ এবং নীচু বিন্দুসমূহ। কেননা, খোদাতায়ালার কাজের মধ্যে যেমন রয়েছে সাদৃশ্য, তেমনি রয়েছে সামঞ্জস্য। এবং তা এজন্যই যে, তিনি এক এবং তিনি তাঁর কাজের মধ্যে একত্বের প্রকাশকে ভালবাসেন। তাঁর কার্যাবলী মধ্যে পেরেশানী, বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের কোন স্থান নেই। কত না প্রিয় এবং কত না যথোপযুক্ত তাঁর কার্যপদ্ধতি! যা একই ধারা ও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চলে এবং যা পরস্পর সুসমন্বিত ও সুসমঞ্জস।

এখন, আমরা যখন সব দিক থেকেই প্রমাণ পেয়েছি এবং আমরা নিজেরাই যখন পর্যবেক্ষণ করে দেখেই খোদাতায়ালার এই সৃষ্টির নিয়মকে মেনে নিয়েছি যে, তাঁর সমস্ত কাজ-তা সে আধ্যাত্মিকই হোক আর জাগতিকই হোক-তার মধ্যে কোন বক্রতা বিভ্রান্তি নেই, গরমিল নেই, বা কোন অসংলগ্নতা নেই, বরং তা এক প্রজ্ঞাপূর্ণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সুসমন্বিত এবং একই প্রক্রিয়ার ধারায় সুসংবদ্ধ-যা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে শুরু হয়ে চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত উপনীত হয়েছে, এবং এই যে অভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি যা তাঁর কাছে প্রিয়; তখন এই সৃষ্টির নিয়মকে মানার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে একথাও মানতে হয় যে, খোদাতায়ালা যেমন বস্তুজগতের সৃষ্টি-ধারায় এক পরমাণু থেকে নিয়ে তাকে সেই বৃহত্তম অস্তিত্ব অর্থাৎ সূর্য পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন, যে সূর্য জাহেরী বা বাহ্যিক যাবতীয় পূর্ণতার আধার, যার থেকে বড় আর কোন সৌর-জাগতিক বস্তু নেই; ঠিক তেমনি কোন আধ্যাত্মিক সূর্যও থাকতে হবে, যার অবস্থান হবে উর্ধ্বমুখী আধ্যাত্মিক সরল রেখার শীর্ষ বিন্দুতে। এখন দরকার এই বিষয়ে গবেষণা করা যে, সেই ইনসানে কামেল বা পূর্ণতম মানব, যাকে আধ্যাত্মিক সূর্য বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তিনি কে এবং তার নামই বা কি? কিন্তু তা শুধু মানবীয় যুক্তিবুদ্ধিতে সম্ভব নয়। কেননা, খোদাতায়ালা ছাড়া কার আছে এই এমতিয়াজ বা বাছাই-ক্ষমতা, এবং কোন সে যুক্তি -বুদ্ধি আছে যা খোদাতায়ালার এই কোটি কোটি অসংখ্য অগনিত বান্দাকে দৃষ্টির সামনে রেখে এবং তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করে তার মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা বড় যে তাকে পৃথক করে দেখাবে? সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধি-আক্কেলের দ্বারা এখানে নাক গলাবার কারো জায়গা নেই। তবে হ্যাঁ, এই বিশাল ও গভীর গবেষণার ক্ষেত্রে কাউকে সাহায্য করতে পারে কেবল ঐশী গ্রন্থাবলী, যার মধ্যে স্বয়ং খোদাতায়ালা আজ থেকে বহুপূর্বেই, বরং হাজার হাজার বছর পূর্বে, সেই ইনসানে কামেলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা

করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির হৃদয়কে খোদাতায়ালা স্বীয় খাস তৌফিক বা সামার্থ্য দান করে এই দিকে পরিচালিত করবেন যে, সে ওহী-ইলহাম বা ঐশীবাণীর প্রতি বিশ্বাসী হবে এবং সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, যা বাইবেলে বর্ণিত আছে, তাহলে তাকে অবশ্যই মানতে হবে যে, সেই যে ইনসানে কামেল, যিনি আধ্যাত্মিক সূর্য, যাঁর দ্বারা উন্নতির শীর্ষ-বিন্দুর স্থান পূরণ করা হয়েছে এবং যিনি নবূয়্যতের সৌধের শেষ ইষ্টক, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-------- এবং সেই আশিস ও কল্যাণের মূর্ত অস্তিত্ব, যাঁর সত্তার বিন্দু চরম উন্নতির চূড়ান্ত স্তরে অবস্থিত, তিনিই হযরতে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাঁর মোকাম হচ্ছে 'মেরাজে খারেজি' বা উর্ধভ্রমনের বহির্সীমা, যা উন্নতির মোকামের চূড়ান্ত সীমা (অর্থাৎ আরশে রব্বুল আলামীন)। প্রকৃত প্রস্তাবে, এতে সেই চূড়ান্ত মর্যাদার পরম পূর্ণতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা অর্জন করেছেন সেই একমাত্র অস্তিত্ব (সাঃ)। এই যে আশিস ও কল্যাণের মূর্ত অস্তিত্ব যা নির্ধারিত করা ছিল কাজা ও কদর-এর জগতে (অর্থাৎ নিয়তির জগতে), তা-ই আলমে মেছালে বা বাহ্যজগতে প্রদর্শিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে অতি সুস্পষ্টরূপে। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা সেই নবী করীম (সাঃ)-এর উন্নত মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন ঃ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ

'এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউ কাউকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন'। অতএব, এই উন্নত মর্যাদার মধ্যে সেটাই চূড়ান্ত মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর, যা জাহেরী ও বাতেনীভাবে অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও গোপনে অর্জন করেছিলেন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এবং এই হচ্ছে সেই আশিস ও কল্যাণসমূহের মূর্ত অস্তিত্ব যা সান্নিধ্য-প্রাপ্তগণের তিন শ্রেণীর চাইতেও অধিক উন্নত এবং পরিপূর্ণ, এবং উলুহিয়াত বা খোদায়ীর সর্বোত্তম প্রকাশ।

জানা প্রয়োজন যে, তিন স্তরের বা শ্রেণীর ঐশী সান্নিধ্যকে তিন প্রকারের সাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত দিয়ে পেশ করা হয়েছে। যার উপরে চিন্তা-ভাবনা করলে নৈকট্যের তিন স্তরের হকীকত বা তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে। প্রথম শ্রেণীর সান্নিধ্যকে বুঝানোর জন্য ভৃত্য বা গোলাম ও মুনীবের সম্পর্কের সাদৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় সুদৃঢ়'-২ঃ১৬৬। অর্থাৎ, মুমিন, যাকে অন্য কথায়, একান্ত অনুগত বান্দা বা গোলাম বলা যায়, যে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসা রাখে তার প্রভুর প্রতি। এর বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোন ভৃত্য যখন স্বীয় প্রভুর সার্বক্ষণিক উপকার বহুবিধ দান এবং চারিত্রিক গুণাবলী দেখে একনিষ্ঠতা, সততা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তার সেবা করে, তখন সে প্রভুর ভালবাসায় ও স্বীয় একনিষ্ঠতায় এত বেশী মগ্ন হয়ে যায় যে, সে প্রভুর গুণাবলীর রঙ নিজের মধ্যে ধারণ করে; প্রভুর মেজাজ মর্জিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলে; এবং তার হৃদয়ে প্রভুর জন্য যে গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হয়, তদ্দরুন সে প্রভুর ইচ্ছা অভিলাষ পূরণ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে এবং নিজেও অনুরূপ ইচ্ছা অভিলাষ পোষণ করে। এমনিভাবে, একই অবস্থার সৃষ্টি হয় এক বান্দারও তার দয়াময় প্রভু আল্লাহ্‌র প্রতি। অর্থাৎ, সেও তার একনিষ্ঠতা, সততা ও বিশ্বস্ততায় উন্নতি করতে করতে সেই স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় যেখানে সে তার

আপন সত্তাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে এবং ফানা বা বিলীন হয়ে যায় এবং আপন দয়াময় প্রভুর রঙে মিশে যায়।

সান্নিধ্যের বা নৈকট্যের দ্বিতীয় শ্রেনীর বা স্তরের সাদৃশ্য হচ্ছে, পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

'অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর তোমাদের পিতাদেরকে স্মরণ করার ন্যায়, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর স্মরণ কর। ২ঃ২০১।' অর্থাৎ, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে এমন হৃদয়ভরা ভালবাসার সহিত স্মরণ করো, যেমন পিতাকে স্মরণ করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, প্রভু তখনই পিতার সদৃশ হতে পারে, যখন তার প্রতি ভালবাসা অতি গভীরভাবে গাঢ় হয়। এবং ভালবাসা সর্ববিধ স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়ের সকল পর্দা ছিন্ন করে হৃদয়ের অন্তঃস্তলে এমনভাবে আসন গ্রহণ করে যে, তা যেন হৃদয়েরই একটা অংশ। তখন যে মহব্বতের জোশ এবং ভালবাসার পাত্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়, আসলেও যা স্বভাবজাত এবং স্বভাবেরই অংশ, তখন তাকে আর মনে হয় না যে, তা কোন চেষ্টা চরিত্রের কারণে সৃষ্ট হয়েছে। যেমন পুত্র তার পিতার কথা স্মরণ করার মধ্যে একপ্রকার আধ্যাত্মিক আকর্ষণ অনুভব করে, তেমনিভাবে, সেও (মুমিন ব্যক্তিও) সব সময় বাতেনীভাবে অনুরূপ আকর্ষণ অনুভব করে। এবং পুত্র যেমন পিতার চেহারা-সুরতের ছাপ নিজের চেহারা-সুরতে ধারণ করে এবং তার মধ্যে পিতার চাল-চলন, আচার-আচরণ প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়, তার (মুমিনের) অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়-----------/

তৃতীয় স্তর বা শ্রেনীর নৈকট্যের সাদৃশ্য হচ্ছে, ব্যক্তির সহিত তার প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য। অর্থাৎ, যখন কোন ব্যক্তি পরিষ্কার আয়নাতে তার চেহারা দেখে, তখন সে তার প্রতিবিম্বে তার চেহারার দাগ-দুগ সবই দেখতে পায়। এমনিভাবে, এই তৃতীয় শ্রেনীর নৈকট্যের বেলায়, সমস্ত ঐশী গুণাবলী তার (খোদা-প্রেমিকের) সত্তায় পরিষ্কারভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। এবং এই প্রতিবিম্বন বা প্রতিফলন উল্লিখিত দুই শ্রেনীর সাদৃশ্যের প্রতিফলনের চাইতে অধিকতর পূর্ণ এবং পরিষ্কার। কেননা, একটা ব্যাপার অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি যখন একটা পরিষ্কার আয়নায় নিজের চেহারা দেখে, তখন সে তার নিজের চেহারা যা, তা-ই দেখে। তার চেহারার অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ চেহারা অন্য কোনও প্রক্রিয়াতেই অন্য কারো চেহারাতে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, এমনকি তার পুত্রের চেহারাতেও হুবহু সাদৃশ্য পাওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রশ্ন এইযে, কার পক্ষে এই মর্তবা অর্জন করা সম্ভব, এবং কে সে, যে নৈকট্যের এই কামেল দর্জা বা পূর্ণ মর্যাদা লাভের অধিকারী? এই প্রশ্নের জবাব এই যে, তারই পক্ষে এটা সম্ভব যে ঐশীত্ব এবং মানবত্বের (উলুহিয়াত এবং উবুদিয়াতের) উভয় ধনুকের মধ্যখানে যথার্থরূপে অবস্থান গ্রহণ করে উভয় ধনুকের সঙ্গে এরূপ পোক্ত সম্পর্ক স্থাপন করে যে, সে যেন এতদুভয়ের অভিন্নরূপ হয়ে যায়। এবং নিজস্ব সত্তাকে উভয়ের মধ্যস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করে পরিষ্কার আয়নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এবং সেই আয়না-উভয় দিকেই মুখোমুখি (দ্বিমূখী) হওয়ার কারণে একদিকে প্রতিবিম্বাকারে সুরতে ইলাহিয়া বা ঐশী চেহারা অর্জন করে, অপরদিকে, তার সঙ্গে যারা সম্পর্কযুক্ত তাদের সকলকেই, তাদের নিজ নিজ মেজাজের গ্রহণ ক্ষমতার অনুপাতে, যাবতীয় কল্যাণ বা ফয়েজ বিতরণ করে। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ 'অতঃপর, সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামলেন। অতঃপর সে দুই ধনুকের একতন্ত্রী (ছিলা) হয়ে গেল, অথবা তা থেকেও নিকটতর হলো। ৫৩ঃ৯,১০।'

পুনরায় নিকটবর্তী হলেন (অর্থাৎ আল্লার দিকে), পুনরায় নীচের দিকে অবতীর্ণ হলেন (অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে তবলীগের কর্মকাণ্ড সম্পাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হলেন)। অতএব, এইভাবে তিনি যেমন উর্ধ্বমূখে উন্নীত হয়ে হয়ে অবশেষে নৈকট্যের চূড়ান্ত স্তরে পৌছে গেলেন যেখানে তাঁর এবং 'সত্য' এর মধ্যখানে কোন পর্দা থাকলো না; এবং পুনরায় তিনি নীচের দিকে অবতীর্ন হলেন, এবং তাঁর ও সৃষ্টির মধ্যখানে কোন পর্দা থাকলো না। অর্থাৎ, যেহেতু তিনি উন্নতিতে এবং অবতরণে সর্বোত্তম ও সম্পূর্ণ হয়েছিলেন এবং পূর্ণতার চরম সীমা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন, সেহেতু, উভয় ধনুকের মধ্যখানে অর্থাৎ ছিলা বা তন্ত্রীর স্থানে (বৃত্তের ব্যসরেখায়) উত্তম ও যথার্থরূপে তাঁর মোকাম ও অবস্থান সুদৃঢ় হয়। বরং তিনি উলুহিয়াৎ বা ঈশ্বরত্বের ধনুক এবং উবুদিয়াৎ বা দাসত্বের ধনুক-এর সান্নিধ্যে আরও গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হলেন। যা মানবীয় চিন্তা ও কল্পনারও উর্ধ্বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই দুই ধনুকের অবস্থান হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ
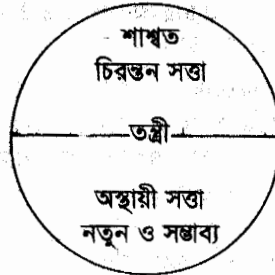
এই চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করে যে রেখাটি টানা হয়েছে, অর্থাৎ, যা বৃত্তটির ব্যাস, তা-ই কাবা কাওছাইন অর্থাৎ, উভয় ধনুকের একতন্ত্রী। জানা দরকার যে, এই উভয় প্রকার সত্তা, শাশ্বত ও সম্ভাব্য, মিলেই গঠিত একটি বৃত্ত, যা তার কেন্দ্র ভেদ করে যাওয়া রেখাটির দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত। সেই যে রেখা, যা বৃত্তের ব্যাস, যাকে কোরআন শরীফে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'কাবা কাওছাইন'-(উভয় ধনুকের একতন্ত্রী)-বলে, এবং সাধারণ কথাবার্তায় জ্যামিতিতে যাকে ব্যাস বলা হয়, তা কল্যাণী ও কল্যাণগ্রাহী (মফিজ ও মুস্তাফিজ) উভয় সত্তার মধ্যখানে মধ্যস্থ বা বরজখ রূপে বিদ্যমান, যা স্বকীয় পূর্ণতায় চরমভাবে পূর্ণ, যার মধ্যে অবস্থিত বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু, যা কি· ব্যাস রেখারও মধ্যস্থিত বিন্দু, তা-ই পূর্ণ-মানবের হৃদয় বা ইনসানে কামেলের ·ল্। এবং তা উলুহিয়াত ও উবুদিয়াত-এর উভয় ধনুকের সঙ্গে সমান সমান রেখায় (সার্ধে) সম্পর্ক রাখে। এবং এটাই হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে যে সব রেখা বা ব্যাসার্ধ টানা সম্ভব তারও সর্বোচ্চ বিন্দু। যদিও উভয় ধনুকের ব্যাসার্ধের মধ্যে আরও বহু বিন্দু রয়েছে, যেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক পূর্ণতারই বিভিন্ন অবস্থান। শুধুমাত্র কেন্দ্রবিন্দু ছাড়া বাকী বিন্দু গুলিতে অন্যান্য নবী-রসূলরা এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা অংশগ্রহন

করতে পারেন। এবং কেন্দ্রবিন্দুর পূর্ণতার রূপ হচ্ছে তা-ই যা ব্যাস-রেখার অধিকারীর মধ্যে অতি সমুন্নত রূপে, বিশেষ ও স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান, যাতে অন্য আর কেউই সত্যিকার অর্থে অংশীদার হতে পারে না। তবে, হ্যাঁ তার আনুগত্য ও অনুবর্তিতার মাধ্যমে প্রতিবিম্বাকারে অংশীদার হতে পারে। এবারে, জানা প্রয়োজন যে, এই কেন্দ্রীয় বিন্দুর নামই হচ্ছে-**'হকীকতে মুহাম্মদীয়া'** অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্তা, যা কিনা এজমালীরূপে জগতের সকল সত্যের উৎস এবং মূল। এবং সত্যিকার অর্থে, এই এক বিন্দু থেকেই প্রকাশিত ও প্রলম্বিত হয়েছে ব্যাসরেখা এবং এই বিন্দুর আধ্যাত্মিকতাই সারাটা ব্যাসের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, যার পবিত্র কল্যাণ দান করা হয়েছে সারাটা ব্যাসকেই। সেই জগৎ, যাকে সুফীরা আল্লাহ্‌র নামসমূহ বা 'আসমা উল্লাহ' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন, তার প্রথম ও সর্বোচ্চ প্রকাশ, যার বিশদ বর্ণনা ঐভাবেই দেওয়া গেছে, তা হচ্ছে সেই কেন্দ্রবিন্দু। যাকে আহ্‌লুল্লাহ্ বা খোদার লোকদের ব্যবহৃত বাগধারায় নাম দেওয়া হয়েছে 'আহ্‌মদ মুজতাবা ও মুহাম্মদ মুস্তফার ব্যাক্তিগত বিন্দু'- (নাফ্‌সী নোকতা আহ্‌মদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা)। এবং দার্শনিকদের বাগ্‌ধারায় তাকেই আক্‌লে আউয়াল' বা আদ্যজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। এই বিন্দুর সঙ্গে ব্যাসের অন্য সব বিন্দুর সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপ যদ্রূপ সম্পর্ক আল্লাহ্‌র 'ইস্‌মে আজম'-এর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য নামের। সংক্ষেপে, সেই যে আয়না, যা ইনসানে কামেল-এর প্রতিফলন ঘটায় এবং যা সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ের উৎসমুখ, এবং সকল নিশ্চয়তার চাবিকাঠি, তা হচ্ছে সেই বিন্দু যা সমস্ত রহস্যের চূড়ান্ত কারণ, আদি ও অন্তের সমস্ত রহস্যের চূড়ান্ত কারণ (Final Cause) এবং ছোট বড় সকল সৃষ্টির হেতু। এ ব্যাপারে চিন্তা-কল্পনা ও ধ্যান-ধারনা করাও মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। এবং যেভাবে প্রত্যেকটি জীবন বা হায়াত খোদাতায়ালার জীবন থেকে কল্যাণ বা ফয়েজ হাসিল করে, এবং প্রত্যেক অস্তিত্বই তাঁরই অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ববান হয়, এবং প্রত্যেক প্রভাব তাঁরই প্রভাবের ফল। সেই একইভাবে, মুহাম্মদীয় বিন্দু, আল্লাহ্‌র হুকুমে, সকল মর্যাদা বা স্তর ও অবস্থানকে তাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা ও মেজাজ অনুপাতে প্রভাবান্বিত করে। যেহেতু, এই বিন্দু প্রতিফলনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল ঐশী মর্যাদাকে একস্থিত করে, সেহেতু একইভাবে, উলুহিয়াতের প্রতিবিম্ব হওয়ার কারণে ঐশী মর্যাদা বা স্তরসমূহের সাদৃশ্য হিসেবে মৌলিক ও আসল ঐশী গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটায় সেই আয়নারই মধ্যে, অর্থাৎ, জীবন, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি, ক্ষমতা, শ্রবন, দর্শন ও কথনশক্তি প্রভৃতি তাদের সকল শাখা-প্রশাখা সহ আয়নার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। কেন্দ্রবিন্দু, যা আল্লাহ এবং সৃষ্টির মধ্যবর্তী বিন্দু অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ও সাল্লামের 'নাফসী নোকতা' বা ব্যক্তিগত বিন্দু, তা শুধু আল্লাাহর কথা বা কলেমাতুল্লার ধারনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমন তা 'মসীহ্'-এর বিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা, এই মুহাম্মদী বিন্দুর মধ্যে প্রতিবিম্বের আকারে সমস্ত ঐশী মর্যাদা একস্থিত রয়েছে। একারণেই, দৃষ্টান্ত মূলক বর্ণনায় হযরত ঈসা মসীহকে, তাঁর মধ্যে যে কমতি রয়েছে তজ্জন্য বলা হয়েছে, পুত্র-সদৃশ। কেননা, ঈসায়ী হকীকত বা সত্তা ঐশী গুণাবলীর উত্তম প্রকাশক নয়। বরং সেগুলির শাখাসমূহের একটি শাখা মাত্র। পক্ষান্তরে মুহাম্মদীয় হকীকত হচ্ছে ঐশী গুণাবলীর সর্বোত্তম ও পূর্ণতম প্রকাশক, যার প্রমাণ যুক্তি-বুদ্ধি ও বাস্তবতার নিরিখে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অতএব, এ কারণেই দৃষ্টান্তমূলক

বর্ণনায়, আসমানী কেতাবসমূহে , আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে স্বয়ং সর্বশক্তিমান খোদার সহিত, যে খোদা পুত্রের নিকটে পিতা-সদৃশ। হযরত মসীহ আলাইহেস সালামের শিক্ষা সংযুক্তিরূপে অপূর্ণ হওয়া, পক্ষান্তরে কোরআনী শিক্ষা অন্য সমস্ত ঐশী শিক্ষার চাইতে উত্তম ও পূর্ণ হওয়া, বস্তুতঃ, ঐ একই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কেননা, অপূর্ণের উপরে অপূর্ণ কল্যাণই বর্ষিত হয় এবং পূর্ণের উপরে পূর্ণ কল্যাণ।

যে সাদৃশ্য আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোরআন শরীফে প্রতিবিম্ব স্বরূপ সর্বশক্তিমান খোদার সহিত দেওয়া হয়েছে, তার বর্ণনার মধ্য থেকে একটি আয়াত হচ্ছে, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ⑨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ⑩ 'অতঃপর, সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও (মুহাম্মদ-সাঃ-এর প্রতি) নিম্নে অবতরণ করলেন। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী (ছিলা) হয়ে গেলো অথবা, তা থেকেও ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল। ৫৩ঃ ৯,১০।)'

অর্থাৎ তিনি (হযরত সৈয়্যদনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজের পূর্ণ থেকে পূর্ণতর তরক্কী বা উন্নতি সমূহের কারণে নৈকট্যের স্তরে দুই ধনুকের মধ্যে একতন্ত্রী হয়ে গেছেন। বরং তারও চাইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর। স্পষ্টতঃই, তন্ত্রীর উপর দিকে রয়েছে ঐশী সত্তার বা উলুহিয়াতের ধনুক। সুতরাং, যখন মুহাম্মদী পূর্ণ পবিত্র সত্তা আপনার গভীর নৈকট্য ও নির্মলতার কারণে তন্ত্রীর সীমা অতিক্রম করে আরও অগ্রসর হলো এবং উলুহিয়াতের দরিয়ার নিকটবর্তী হলো, এবং সেই কূল-কিনারাহীন দরিয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লো, তখন, উলুহিয়াতের মহাসমুদ্রে মানবত্বের অণু-পরমাণু গুম হয়ে গেল। এবং এই অগ্রসর হওয়াটা কোন নতুন বা সাময়িক ব্যাপার ছিল না বরং তা আদিকাল থেকেই অগ্রসর ছিল। এবং প্রতিবিম্বের আকারে গ্রহীতাস্বরূপ এ বিষয়ে যোগ্য ছিল বলেই আসমানী কেতাবসমূহে এবং ইল্‌হামী রচনাবলীতে তাকে উলুহিয়াতের সর্বোত্তম প্রকাশক সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এছাড়া, কোরআন শরীফের আর একটি আয়াত, যেখানে এই সাদৃশ্যকেই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এবং উজ্জ্বলরূপে পেশ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

'নিশ্চয় যারা তোমার হাতে বায়াত করে, তারা বস্তুতঃপক্ষে, আল্লাহ্‌র বায়াত করে; আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে আছে। ৪৮ঃ১১।'

অর্থাৎ, যে লোক তোমার নিকটে বায়াত করে সে খোদার নিকটে বায়াত করে। খোদার হাতই তাদের হাতের উপরে। স্পষ্টতঃ যে ব্যক্তি আঁহযরত (সাঃ)-এর কাছে বায়াত করে সে আঁহযরত (সাঃ)-এর হাতে হাত রেখেই বায়াত করে, এবং পুরুষদের জন্য এটাই বায়াত করার পদ্ধতি। অতএব, এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা রূপকের আকারে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় সত্তাকে নিজের সত্তারূপেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং তাঁর হাতকে বলছেন নিজের হাত। এই কথায় **'মোকামে জমা'** বা 'একত্রে মিলিত' হওয়ার অবস্থাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এবং যা ব্যক্ত করা হয়েছে অতীব নৈকট্যের দরুন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য। এই যে 'জমা' বা

একস্থ হওয়া, যা উভয় পক্ষের পরিপূর্ণ মহব্বতের অবস্থান, তারই প্রতি ইংগিত করে আরও একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

'যখন তুমি (কংকর ও বালু) নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন। ৮ঃ১৮'

এমনিভাবে আরও একটি আয়াতে আল্লাতায়ালা বলেছেন ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

'তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। ৩৯ঃ৫৪।'

অর্থাৎ, তাদেরকে তুমি বলে দাও, হে আমার বান্দারা! যারা তোমরা নিজেদের প্রাণের উপরে বাড়াবাড়ি করেছ (অর্থাৎ বড় বড় পাপাচার করেছ) তোমরা খোদার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, খোদা তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। এটা তো জানা কথাই যে, বনী আদম তো আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর বান্দা নয়, বরং নবী ও গায়েব নবী সকলই আল্লাহ্রই বান্দা। কিন্তু, যেহেতু আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর মওলা করীমের (আল্লাহ্তায়ালার) সহিত নিবিড়তম নৈকট্য, অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, সেহেতু, এই কথা বলা হয়েছে সেই **'মোকামে জমা'**-এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই এবং 'মোকমে জমা' হচ্ছে 'কাবা কাওছাইন'-এর মোকাম, যার কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে তাসাউফ,-এর কেতাবসমূহে।

এমনিভাবে, 'মোকামে জমার' পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতায়ালা আঁহযরত(সাঃ)-এর এমন কিছু নাম রেখেছেন, যা খাস করে তাঁরই গুণাবলী। যেমন, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম রাখা হয়েছে-'মুহাম্মাদ'-যার তর্জমা হচ্ছে, অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরং, চূড়ান্ত স্তরের এই যে প্রশংসা, তা তো সত্যিকার অর্থে খোদাতায়ালার মর্যাদার জন্যই যোগ্য। কিন্তু, তা-ও প্রতিবিম্বাকারে দান করা হয়েছে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে। কোরআন শরীফে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম দেওয়া হয়েছে 'নূর'-আলো, যা দুনিয়াকে আলোকিত করছে; 'রহমত', যা জগতকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছে, বাঁচিয়ে রাখছে ; 'রউফ ও রহীম' যা কিনা খোদাতায়ালারই নাম, এসব নামেও ডাকা হয়েছে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে। তাঁর আরও কিছু মোকামের কথা কোরআন শরীফে ইশারা-ইংগিতে এবং পরিষ্কারভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। **আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐশী সত্তার বা উলুহিয়াতের সর্বোত্তম প্রকাশক ও প্রকাশস্থল; এবং তাঁর কালাম খোদারই কালাম ; এবং তাঁর প্রকাশ খোদারই প্রকাশ ; এবং তাঁর আগমন খোদারই** আগমন। তাই, এ ব্যাপারে কোরআন শরীফের একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 'এবং তুমি বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য'১৭ঃ৮২।

সত্য বা হক্ক্ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুকে, কোরআন শরীফকে এবং আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে। এবং মিথ্যা বা বাতিল বলতে বোঝানো হয়েছে শয়তানকে, শয়তানের দলকে এবং শয়তানী শিক্ষা-দীক্ষাকে। অতএব, দেখো'! খোদাতায়ালা কীভাবে নিজের নামের মধ্যে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন। এবং আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকাশিত হওয়াই খোদাতায়ালার প্রাকাশিত হওয়া। এবং তা এমন প্রখর ও প্রতাপশালী প্রকাশ, যার প্রভাবে শয়তান তার সকল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পলিয়ে গেছে এবং তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা লাঞ্ছিত ও ঘৃনিত হয়ে গেছে, এবং তার দল দারুনভাবে পরাস্ত হয়েছে।

এইরূপ পূর্ণ জমা-(মোকামে জমায় পরিপূর্ণতা) -এর কারণে সূরা আলে ইমরানের তৃতীয় রুকুতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সকল নবীরসূলদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য এবং অপরিহার্য যে, তারা খাতামুররুসুলের মহিমা ও প্রতাপ বা জালালের কারণে তাঁর উপরে অর্থাৎ, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে ঈমান আনবে, এবং তাঁর সেই মহিমা ও সেই জালালের প্রচারণার কাজে মনপ্রাণ দিয়ে সহায়তা করবে। একারণেই, হযরত আদম সফিউল্লাহ থেকে নিয়ে হযরত মসীহ্ কলেমাতুল্লাহ্ পর্যন্ত যত নবী ও রসূল অতীত হয়ে গেছেন তাঁরা সবাই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহিমা ও প্রখর প্রতাপের স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়ে দিয়ে এসেছেন। হযরত মূসা আলাইহেস সালাম তৌরিতের মধ্যে এই কথা বলেছেন যে, **খোদা সিনাঈ থেকে এসেছেন এবং সাঈর থেকে উদিত হয়েছেন, এবং ফারান পর্বত থেকে তাঁর জ্যোতি প্রকাশিত হয়েছে।** তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, ঐশী প্রতাপ ও গৌরব বা ইলাহী জালাল-এর প্রকাশ ফারানের উপরে এসেই পুর্ণতায় পৌছে গেছে। এবং সত্যের সূর্যের উজ্জ্বলতম রশ্মিমালা ফারানের উপরে পতিত হয়েই প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেই তৌরিতই আমাদেরকে একথাও বলে দিচ্ছে যে,ফারান হচ্ছে মক্কা মুয়াজ্জামার পাহাড়, যেখানে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুর্বপুরুষ হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালাম তাঁর আবসাস্থল গড়ে তুলেছিলেন । এবং একথা ভৌগলিক মানচিত্র দ্বারাও সপ্রমানিত। এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও জানে যে, মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য আর কোন রসূল আবির্ভূত হননি। অতএব, দেখো! মুসার দ্বারা কী রকম সাফ সাফ সাক্ষ্য দান করা হয়েছিল যে, সেই সত্যের সূর্য, যা ফারান পর্বত থেকে উদিত হবে তার রশ্মিমালাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রখর হবে এবং ক্রমোন্নতির ধারায় সত্যের আলো, তাঁরই সর্বকল্যাণময় সত্তার মধ্যেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। --------------------

এই সমস্ত আলোচনার মূল কথা এবং সার-সংক্ষেপ হচ্ছে, খোদার নৈকট্যের স্তর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নৈকট্যের তৃতীয় যে স্তর, যা ঐশীসত্তা বা উলুহিয়াতের সর্বোত্তম প্রকাশক ও প্রকাশস্থল এবং যা দীদারে ইলাহী বা খোদা-দর্শনের আয়না, তা হযরত সৈয়্যদনা ও মওলানা-আমাদের নেতা ও আমাদের প্রভু-মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য সংরক্ষিত। যাঁর রশ্মিমালা হাজারো হৃদয়কে আলোকিত করে তুলছে। এবং অগনিত বক্ষঃস্থলকে আভ্যন্তরীন অন্ধকার রাশি থেকে মুক্ত করে নূরে

কদীম বা চিরন্তন আলোতে আল্লাহ্তে পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। চমৎকার কথা বলেছেন এক ব্যক্তি !

মুহাম্মদ আরাবী বাদশাহে হর্ দোছরা,
করে হ্যায় রূহে কুদ্দুছ যেছ কে দর কা দরবাণী।
উছে খোদা তো নেহী কাহ্ ছাকোঁ পে কাহ্তা হোঁ,
'উছ্ কে মর্তবাদানী মে হ্যায় খোদা দানী।'

মুহাম্মদ আরাবী দোজাহানের বাদশাহ্,
রূহে কুদ্দুছ করে যার দুয়ারে দ্বারওয়ানী।
তাকে খোদা তো বলতে পরিনা তবে, বলি যে,
তাঁর মর্তবা জানাতেই নিহিত খোদাকে জানা।

সেই ব্যক্তি কতই না ভাগ্যবান, যে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তার নেতারূপে কবুল করেছে এবং কোরআন শরীফকে গ্রহণ করেছে তার পথপ্রদর্শক রূপে।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদনা ও মওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলেহি ওয় আস্হাবেহী আজমাঈন।

আলহামদু লিল্লাহিল্ লাজি হাদা কুলুবানা লেহুব্বেহি ওয়ালে হুব্বে রাসূলিহি ওয়া জামিয়ে এবাদেহিল মুকার্রাবীন।

হে আল্লাহ্! তুমি আশিস ও কল্যাণ বর্ষণ কর আমাদের নেতা ও প্রভু মুহাম্মদের উপরে এবং তাঁর সকল বংশধর এবং তাঁর সকর সাথীগণের উপরে।
সকল প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার যিনি আমাদের হৃদয়গুলিকে পরিচালিত করেছেন তাঁর নিজের ভালাবাসার প্রতি এবং তাঁর রসূলের ভালবাসার প্রতি এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণের ভালবাসার প্রতি।

....

– (সুরমা চশমা আরিয়া, পৃঃ১৮৫-২৫১,পাদটীকা)।

(২৬)

'কোরআন শরীফে এই বিষয়টিকে একটি আয়াতে সুন্দর উপমা দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনা একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব সহকারে আমরা লিপিবদ্ধ করছি। যে তত্ত্ব সেই আয়াতের তফসীরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এই বিতর্কের সমাধানের জন্য জরুরী। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলীর এবং পৃথিবীর নূর (আলো); তার নূরের উপমা হলো একটি তাক সদৃশ-যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপটি আছে একটি গোলাকার কাঁচের চিমনীর ভিতরে, সেই কাঁচের চিমনীটি এমনই দীপ্তিমান যেন সেটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেটি (প্রদীপটি) এমন এক কল্যাণ-পূর্ণ জয়তুন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত যা না পূর্বের না পশ্চিমের (বরং তা সারা বিশ্বের) ; তার তৈল এমন যে এক্ষুনি তা যেন স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে জ্বলে উঠবে, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও। নূরের উপর নূর। আল্লাহ্ যাকে চান তাঁর নূরের দিকে হেদায়াত দান (পরিচালিত) করেন। এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।' ২৪ঃ৩৬।

আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের নূর (আলো),অর্থাৎ প্রত্যেক নূর যা উর্ধ্বে এবং নিম্নে পরিদৃষ্ট হয়, তা সে আত্মাসমূহের মধ্যেই হোক আর দেহসমূহের ভেতরেই হোক, ব্যক্তিগত হোক আর অর্জিত হোক, জাহেরী হোক আর বাতেনী হোক, আভ্যন্তরীণ হোক আর বাহ্যিক হোক, সবই তারই ফয়েজ বা কল্যাণ ও কৃপা থেকে প্রদত্ত দান। এতে এই ইংগিতই চিহ্নিত যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সাধারণ কৃপা বা রহমত সবকিছুকেই পরিবেষ্টণ করে আছে। এবং কোন কিছুই তাঁর রহমত ও কৃপা থেকে বঞ্চিত নয়। তিনিই সকল ফয়েজ বা কৃপা ও কল্যাণের এবং প্রাচুর্যের উৎস। এবং সকল প্রকার আলোকের কারণের কারণ। এবং সকল কৃপা ও রহমতের উৎস সমুহ। তাঁরই সত্তা সকল বিশ্বজগতের অবলম্বন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কিছুর আশ্রয় স্থল। তিনিই সব কিছুকে নাস্তির অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে এনেছেন এবং অস্তিত্বের সজ্জায় সজ্জিত করেছেন। এছাড়া, এমন আর কোনও অস্তিত্ব নেই যা নিজ অধিকারে নিজে নিজেই অস্তিত্ববান কিংবা চিরন্তন অথবা তাঁর কল্যাণ ও কৃপা প্রাপ্ত। বরং মৃত্তিকা এবং আকাশ এবং মানুষ এবং প্রাণী এবং পর্বত এবং বৃক্ষ এবং আত্মা এবং শরীর সব কিছুই তাঁরই ফয়েজ বা কৃপা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ হচ্ছে সেই সাধারণ কৃপা ও কল্যাণ বা **'আম ফয়েজ'** যার বর্ণনা করা হয়েছে 'আল্লাহু নূরুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদ'-আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর–আয়াতে করীমার মধ্যে। এ হচ্ছে সেই কৃপা বা রহমত যা বৃত্তের আকারে সমস্ত কিছুকেই পরিবেষ্টণ করে আছে। এবং যে কৃপা লাভ করার জন্য কোন যোগ্যতার শর্ত পূরণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, এর মোকাবেলায় এক **'খাস ফয়েজ'** বা বিশেষ কৃপা ও কল্যাণ আছে, যার জন্য অনেক শর্ত পূরণ করতে হয়। যা কেবল সেই সকল ব্যক্তির উপরেই বর্ষিত হয় যাদের মধ্যে তা গ্রহণ করবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ তা শুধু বর্ষিত হয় পূর্ণ বা কামেল ব্যক্তিগণের উপরে, নবীগণের উপরে (তাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক)। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং সর্বকল্যাণমণ্ডিত সত্তা হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অন্যদের উপরে সেই কৃপা ও কল্যাণ কখনই বর্ষিত হবে না। এবং যেহেতু, সেই কল্যাণ ও কৃপা বা ফয়েজ এক অতি সুক্ষ্ম সাদাকাত বা সত্যতা, এবং সুক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বাবলীর মধ্যে একটি সুক্ষ্ম প্রশ্ন, সেহেতু খোদাওন্দ তায়ালা প্রথমে সাধারন কল্যাণ ও কৃপা, যা সাধারণভাবে প্রকাশিত, তার কথা বর্ণনা করার পর পুনরায় সেই খাস বা বিশেষ কল্যাণ

ও কৃপার কথা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নূর বা আলো প্রকাশিত করা। এবং এই উদ্দেশ্যে যে সাদৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা-ও উক্ত আয়াতের শুরুতেই আছে ঃ

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

– (তার নূরের উপমা হলো একটি তাক সদৃশ যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ)-

সাদৃশ্য দিয়ে বর্ণনা এজন্যই করা হয়েছে যাতে করে সেই সুক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়টি উপলব্ধি করতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, কোন অসুবিধা না থাকে। কেননা, কোন বিষয়ের অর্থ তাৎপর্যকে কোন বোধগম্য উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করলে তা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরও বুঝতে কষ্ট হয় না। আলোচ্য আয়াতে করীমার বাকী অংশের তর্জমা হচ্ছেঃ সেই নূরের উপমা (পূর্ণ মানবের মধ্যে যিনি পয়গম্বর) এই যে, যেমন একটি তাক (অর্থাৎ হযরত পয়গম্বরে খোদা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর উপযুক্ত ও প্রসারিত বক্ষঃস্থল) এবং সেই তাকের মধ্যে একটি প্রদীপ (অর্থাৎ আল্লাহর ওহী) এবং প্রদীপটি গোলাকার কাঁচের চিমনীর ভিতরে যা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাফ(অর্থাৎ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পুত পবিত্র দিল্ বা হৃদয়, যা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিল্, যা আপন প্রকৃতিগতভাবেই স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় সকল প্রকারের মালিন্য ও বক্রতা থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পবিত্র এবং আল্লাহ্র সম্পর্ক ব্যতীত বাকী সমস্ত সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত), সেই কাঁচ এমন পরিষ্কার যে তা নক্ষত্ররাজির সধ্যে সর্বাপেক্ষা অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, যা আকাশে প্রবল উজ্জ্বলতা সহকারে সগৌরবে জ্যোতির্মালা বিকীর্ণ করে চলেছে যাকে বলা হয় 'কাওকাবে দুর্রি'------(অর্থাৎ হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয় , যা এতো পরিষ্কার যে, তা কাওাকবে দুর্রির' ন্যায় অতিশয় আলোকিত ও জ্যোতি বিকীর্ণকারী, যার আভ্যন্তরীণ আলো বাইরের সমতলে পানির মত প্রবাহিত হয়)। সেই প্রদীপ জয়তুনের কল্যাণময় বৃক্ষ দ্বারা (অর্থাৎ জয়তুনের তেল দ্বারা) আলোকিত করা হয়েছে। (কল্যানময় জয়তুন বৃক্ষ দ্বারা বুঝানো হয়েছে মুহাম্মদ-সাঃ-এর পবিত্র অস্তিত্বকে যা বিভিন্ন প্রকারের বরকত বা কল্যাণ সমূহের জমাকৃত ও সমন্বিত রূপ, যার কল্যাণ ও কৃপা কোন স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সকল মানুষের জন্য সার্বজনীন এক চিরস্থায়ী প্রবাহ, যা সর্বদাই জারি রয়েছে এবং যা কখনই শেষ হবার নয়।) এবং সেই যে কল্যাণময় বৃক্ষ, তা না পূর্বের, না পশ্চিমের (অর্থাৎ মুহাম্মদীর প্রকৃতির মধ্যে না আছে কোন বাড়তি, না কোন কমতি বরং তা সর্বোত্তমভাবে পরিমিত ও সুসমন্বিতরূপে সত্তাবান এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে নির্মীত)।

এবং এই যে বলা হয়েছে যে, সেই মুবারক বৃক্ষের তেল দ্বারা ওহী বা ঐশীবাণীর প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, সেই তেল বলতে বুঝানো হয়েছে উন্নত নৈতিক গুণাবলীসহ মুহাম্মদী নূরানী সুক্ষ্ম বুদ্ধিকে, যা সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানের স্বচ্ছ ঝরণা দ্বারা লালিত-পালিত। মুহাম্মাদীয় উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সুক্ষ্ম-জ্ঞান দ্বারা ওহীর প্রদীপ জ্বালানোর অর্থ হচ্ছে, সেই যোগ্য উন্নত নৈতিকতা ও সুক্ষ্ম জ্ঞানের উপরে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এবং ওহী

অবতীর্ন হওয়ার কারণও সেই উন্নত নৈতিকতা সুক্ষ্ম ও জ্ঞান। এর মধ্যে এই ইংগিত রয়েছে যে, ওহীর কল্যাণময়তারও অবতরণ হয়েছে লাতায়েফে মুহাম্মদীয়া মোতাবেক অর্থাৎ মুহাম্মদীয় সুক্ষ্ম-জ্ঞান ও নৈতিকতার অনুপাতে, এবং এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তাঁর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে তা তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েই নাযিল হয়েছে। একথার ব্যাখ্যা এটাও যে, প্রত্যেক নবীর উপরে যে ওহী নাযিল হয়েছে তা সেই নবীর (আঃ) প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নাযিল হয়েছে। যেমন, মুসা আলাইহেস সালামের মেজাজের মধ্যে প্রতাপ ও ক্রোধ ছিল, তৌরিতও ছিল মুসায়ী প্রকৃতি অনুযায়ী এক গৌরব বা প্রতাপপূর্ণ বা জালালী শরীয়ত। হযরত মসীহ্ আলাইহেস সাল্লামের মেজাজে ছিল বিনয় ও নম্রতা, তাই, ইঞ্জিলের শিক্ষাও বিনয় ও নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মেজাজ ছিল চরম স্তরের অবিচলতার উপরে অধিষ্ঠিত। তাঁর মেজাজ যেমন সর্বক্ষেত্রেই নম্রতা অবলম্বন করতো না, তেমনি তা প্রতি ক্ষেত্রে ক্রোধান্বিতও হতো না। বরং, ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচার-বিবেচনা করে তিনি তাঁর মেজাজের ব্যবহার করতেন। তাই, কোরআন শরীফও নাযিল হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি ও সমতা বজায় রেখে, যার মধ্যে সমন্বিত রূপে নিহিত রয়েছে-ভীষণতা ও দয়া, ভীতি ও অনুকম্পা, কঠোরতা ও নম্রতা। সুতরাং, এক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা পরিষ্কার বলেছেন যে, ফুরকানের ওহীর প্রদীপ ঐ মুবারক বৃক্ষের দ্বারা আলোকিত করা হয়েছে যা না তো পূর্বের, না পশ্চিমের। বরং তা নাযিল করা হয়েছে মধ্যম প্রকৃতির মুহাম্মদীয় মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। যার মধ্যে না মুসবী মেজাজের কঠোরতা আছে, না ঈসায়ী মেজাজের নম্রতা আছে। বরং তা কঠোরতা এবং নম্রতা এবং ক্রোধ এবং অনুকম্পার এক সমন্বিত রূপ। এবং গৌরব, প্রতাপ ও সৌন্দর্যের-জালালী ও জামালী গুণাবলীর যথপোযুক্ত প্রকাশস্থল। এবং আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অতি উন্নত নৈতিকতা, যা অতিসূক্ষ্ম জ্ঞান বুদ্ধির তৈলস্বরূপ যার দ্বারা ঐশীবাণী বা ওহীর প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, তার সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহতায়ালা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ 'নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত (৬৮ঃ৫)। অর্থাৎ, হে নবী; তুমি অত্যুন্নত নৈতিক গুণাবলী দ্বারা সৃষ্ট। অর্থাৎ, তিনি (সাঃ) আপন সত্তায় সমস্ত উন্নত গুণাবলীতে এরূপ পারফেক্ট ও পরিপূর্ণ যে, তার বেশী কল্পনা করা আর সম্ভবই নয়। কেননা, আরবী বাগধারায় 'আজিম' শব্দটি যখন কোন কিছু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তখন বুঝতে হবে, সেই বিষয় বা বস্তু স্বীয় পূর্ণতায় চরমত্বে পৌঁছে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বলা হয়, এই বৃক্ষটি 'আজিম' বৃক্ষ, তাহলে তার অর্থ হবে, একটা বৃক্ষের উচ্চতা ও প্রসারতা যতটা হওয়া সম্ভব তা সবই ঐ বৃক্ষটির আছে। অনেক অভিধানবিদ বলেছেন, 'আজিম' বলা হয় তাকেই, যার আজমত এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তা ধ্যান–ধারণারও বাইরে। 'খুলক' শব্দ দ্বারা, কোরআন শরীফে এবং অন্যান্য জ্ঞানের গ্রন্থে শুধু এটাই বুঝানো হয়নি যে, এর অর্থ সদ্ব্যবহার, দয়া-মায়া এবং সভ্যতা-ভব্যতা। 'খাল্‌ক' (খে এর উপরে জবর') এবং 'খুল্‌ক' (খে এর উপরে পেশ') দুটো স্বতন্ত্র শব্দ। এবং শব্দ দুটি পাশাপাশিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'খাল্‌ক' হচ্ছে ঐ সমস্ত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যা খোদাতায়ালা মানুষকে দান করেছেন, এবং যদ্বারা মানুষকে পশু থেকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। পক্ষান্তরে,'খুলক' হচ্ছে ঐ সমস্ত আভ্যন্তরীণ গুনাবলী যার

নিরিখে মানবীয় সত্তাকে পশুর সত্তা থেকে স্বতন্ত্র করা যায়। সুতরাং, যে সকল আভ্যন্তরীণ গুণাবলী দ্বারা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করা যায় তা সবই 'খুলূক'-এর অন্তর্ভূক্ত। মানব প্রকৃতির বৃক্ষ মধ্যম অবস্থার উপরে ভিত্তি করেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত, এবং তা বাড়াবাড়ি ও টানটানি বা বাড়তি ও কমতি থেকে মুক্ত, (বাড়তি ও কমতির অবস্থাটা লক্ষ্য করা যায় পশুর মধ্যে-)। মানবের সেই প্রকৃতির দিকে ইশারা করেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

'নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করেছি।' ৯৫ঃ৫। এই জন্য 'খুলূক' শব্দটি দ্বারা সব সময় উন্নত নৈতিকগুণাবলীই বুঝায়, যদি না তার সাথে ব্যতিক্রমী কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেই উন্নত চরিত্র যা মানবিকতার মূল বা হকীকতে ইনসানিয়াত তা হচ্ছে ঐ সমস্ত আভ্যন্তরীণ গুণাবলী যা মানুষের স্বাভাবিক সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। যেমন, পরিচ্ছন্ন যুক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরিষ্কার স্মরণশক্তি, ভাল স্মৃতিশক্তি, সতীত্ব, বিনয়, ধৈর্য, সন্তোষ, খোদাভীরুতা, দৃঢ়চিত্ততা, অধ্যবসায়, সুবিচার, আমানত-দারী ও আস্থাশীলতা, যথাস্থানে দানশীলতা, যথাস্থানে ত্যাগ, যথাস্থানে দয়াশীলতা, যথাস্থানে উপকার বা কল্যাণ সাধন, যথাস্থানে সাহসিকতা, যথাস্থানে নম্রতা, যথাস্থানে সহিষ্ণুতা, যথাস্থানে ঘৃণা, যথাস্থানে সৌজন্য, যথাস্থানে শ্রদ্ধা-ভক্তি, যথাস্থানে কৃপা ও অনুকম্পা, যথাস্থানে দয়া-মায়া, যথাস্থানে ক্ষমা, যথাস্থানে ভীতি, যথাস্থানে ভালবাসা, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন ও আত্মসমর্পন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এবং সেই তৈল এমন সাফ ও স্বচ্ছ যে তা যেন অগ্নি-সংযোগ ছাড়াই জ্বলে উঠবে। অর্থাৎ সেই নিষ্পাপ বা মাসুম নবী (সাঃ) এর যুক্তি বুদ্ধি এবং উন্নত গুণাবলী এমন পরিপূর্ণ এবং যথাযথ এবং এমন সুক্ষ্ম এবং আলোকিত যে, তা ওহী প্রাপ্তির পূর্বেই জ্বলে ওঠার জন্য প্রস্তুত ছিল। 'নূরুন আলা নূর'–আলো আপতিত হয়েছে আলোর উপরে। অর্থাৎ যেহেতু হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও মঙ্গলময় সত্তার মধ্যেই অনেক প্রকারের আলো বিদ্যমান ছিল, সেহেতু সেই আলোসমূহের উপরে আরও এক আসমানী নূর বা আলো, যা আল্লাহ্‌র ওহী, তা আপতিত হয়েছে এবং তা পতিত হওয়ার ফলে খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) এর সমগ্র সত্তা আলোর মিলনস্থলে বা মাজমাউল আনওয়ারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।'

– (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ১৮১-১৮৫, হাশিয়া, ১১)।

(২৭)

'মে'রাজ (আধ্যাত্মিক উর্ধ্বভ্রমন) ছিল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ (দুনিয়া থেকে)। এর মধ্যে রহস্য ছিল রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আত্মিক অবস্থান প্রকাশিত করা। আসমানে প্রত্যেক আত্মার জন্য একটি করে বিন্দু রয়েছে, তাকে অতিক্রম করে সে আর অগ্রসর হয় না। রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আত্মার বিন্দু ছিল 'আরশ'। এবং 'রফীকে আলা'-এর অর্থ হচ্ছে খোদা। অতএব, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চাইতে বড় মর্যাদাবান ও বড় সম্মানিত আর কেউ নেই।' –(মালফুজাত, খ.২, পৃঃ১৩৬)।

(২৮)

'মেরাজ'-এর ভ্রমন এই স্থুল দেহ সহকারে হয়নি। বরং তা ছিল এক অতি উন্নত স্তরের 'কাশ্‌ফ' বা দিব্যদৃষ্টি। ঐ কাশ্‌ফ এতো বেশী পরিষ্কার ছিল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাকে জাগ্রত অবস্থা বলাই বাঞ্ছনীয়। এই প্রকারের কাশ্‌ফী অবস্থায় মানুষ এক আলোর দেহ সহকারে তার আত্মার ক্ষমতা অনুসারে আসমানসমূহে ভ্রমন করতে পারে। অতএব, যেহেতু আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আত্মা ছিল সর্বোন্নত ক্ষমতার অধিকারী, সেহেতু তা উন্নতির চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এজন্যই তিনি (সাঃ) তাঁর মেরাজের সফরে বিশ্বজগতের সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যে বিন্দুকে 'আরশে আজীম' নামে অভিহিত করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়। সুতরাং, এই সফর ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে 'কাশ্‌ফী সফর, যা সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। বরং তা ছিল এক প্রকারের জাগ্রত অবস্থাই। আমি একে কখনই স্বপ্ন বলবো না, এবং কখনই কোন নিম্ন বা সাধারন স্তরের কাশ্‌ফ বলেও আখ্যায়িত করবো না। বরং এই কাশ্‌ফ ছিল সর্বোচ্চ স্তরের কাশ্‌ফ, যা সত্যিকার অর্থে জাগ্রত অবস্থা; এমনকি, এই স্থুল দেহের জাগ্রত অবস্থার চাইতেও অধিকতর পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল। এবং এই প্রকারের কাশ্‌ফের অভিজ্ঞতা স্বয়ং এই লেখকেরও আছে।' —(এজালা আওহাম, পৃঃ ২৬, পাদটীকা)।

(২৯)

'যে ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানবের উপরে কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছে তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল না। দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর হামদর্দী বা সহানুভূতিতে কোন প্রকার কমতি বা ত্রুটি ছিল না, বরং, যামানা বা কালের দৃষ্টিকোন থেকে এবং স্থানের দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর আত্মার মধ্যে সহানুভূতি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই, কুদরত বা প্রকৃতির জ্যোতির্ময় প্রকাশের পূর্ণ ও পারফেক্ট অংশ তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এবং তিনি **'খাতামুল আম্বিয়া'**(নবীগণের মোহর) হয়েছিলেন। কিন্তু, তা এই অর্থে নয় যে, আগামীতে তাঁর থেকে আর কোনও রূহানী ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করা যাবে না। বরং, তা এই অর্থে যে, তিনি হচ্ছেন 'সাহেবে খাতাম' বা মোহরের অধিকারী।.তাঁর ঐ মোহর ব্যতীত কারো উপরেই কোনও কল্যাণ বর্ষিত হতে পারে না। এবং তাঁর (সাঃ) উম্মতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার সঙ্গে বাক্যালাপের বা ওহী-ইলহাম লাভের দরজা কখনই বন্ধ হবে না। এবং তিনি ছাড়া অন্য আর কোন নবীই মোহরের অধিকারী ছিলেন না। একমাত্র তিনিই সেই (অধিকারী) যাঁর মোহর দ্বারা এরূপ নবূয়্যত লাভ করা যায়, যার জন্য 'উম্মতি' হওয়া আবশ্যক। এবং তাঁর (সাঃ) সাহসিকতা ও সহানুভূতি উম্মতকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে রাখতে চায়নি, এবং তাদের উপরে ওহীর দরজা, যা সকল মারেফাতের আসল শিকড়, তা বন্ধ থাকাটা বরদাস্ত করতে পারেনি; তবে হ্যাঁ, নিজস্ব খতমে রেসালাত-এর নিদর্শন কায়েম রাখার জন্য এটাই চেয়েছিল যে, ওহীর কল্যাণ কেবল তাঁরই (সাঃ) অনুবর্তিতায় লাভ করা যাবে, এবং যে ব্যক্তি উম্মতি নয় তার জন্য ঐশী ওহীর দরজা বন্ধই থাকবে। এবং এই অর্থেই খোদাতায়ালা তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া করেছেন। অতএব, কেয়ামত পর্যন্ত এই সত্য কায়েম থাকবে যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত আনুগত্য দ্বারা নিজের উম্মতি হওয়া সাব্যস্ত করবে না, এবং তাঁর (সাঃ) আনুগত্যের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে বিলীন করে দিবে না, সেই রূপ ব্যক্তি কেয়ামত পর্যন্ত না কোন পূর্ণ ওহী প্রাপ্ত হবে, না সে পূর্ণ ওহী-

প্রাপক বা মূলহাম হতে পারবে। কেননা, সরাসরি নবূয়্যত (মুস্তাকিম নব্যুয়ত) আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয় সাল্লামের উপরেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু, জিল্লী নবূয়্যত (প্রতিবিম্ব নবূয়্যত), যার অর্থ হচ্ছে, শুধু মুহাম্মদীয় ফয়েজ বা আশিসের মাধ্যমে ওহী লাভ করা, তা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে; যাতে করে মানুষের পূর্ণ উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে না যায় এবং পৃথিবীতে নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া শেষ হয়ে না যায়। তাই, আঁহযরত (সাঃ)-এর সাহসিকতা বা হিম্মত এটাই চেয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সম্বোধিত হওয়ার দরজা যেন কেয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকে এবং নিগূঢ় ঐশী তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাতে ইলাহিয়া, যা কিনা নাজাত বা পরিত্রাণের ভিত্তি, তা যেন চিহ্নিচহ্ন হয়ে না যায়।' –(হকীকাতুল ওহী, পৃঃ ২৭,২৮)।

(৩০)

'আমি দৃঢ় ইয়াকীন ও দাবীর সঙ্গে বলছি যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে কামালাতে নবুয়্যত (নবূয়্যতের পরিপূর্ণতা) শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি ঝুটা এবং প্রতারক যে তাঁর (সাঃ) খেলাপে বা বিরুদ্ধে এবং বাইরে কোন সিলসিলা কায়েম করে বা অন্য কোন ধারা স্থাপন করে। এবং তাঁর (সাঃ) নবূয়্যত থেকে আলাদা হয়ে কোন সত্যতা উপস্থাপন করে এবং নবূয়্যতের ঝরণা-প্রবাহকে পরিত্যাগ করে। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত, তাঁর (সাঃ) পরে, অন্য কাউকে স্বতন্ত্র নবী বলে বিশ্বাস করে, এবং তাঁর খতমে নবূয়্যতকে ভেঙ্গে ফেলে। এটাই হচ্ছে সেই কারণ যে জন্য, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর এমন কোন নবী আর আসতে পারবে না যার উপরে নবূয়্যতে মুহাম্মদীয়ার মোহর থাকবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানেরা এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে যে, তারা খতমে নবূয়্যত ভেঙ্গে ফেলে আসমান থেকে এক ইসরাঈলী নবীকে আনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু, আমি বলছি যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র-করণ শক্তি এবং তাঁর চিরন্তন নবূওয়্যতের এ এক সামান্য নিদর্শন যে, তেরশ' বছর পরেও তাঁর (সাঃ) শিক্ষা-প্রশিক্ষন বা তালিম-তরবিয়তের ফলশ্রুতিতে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই মসীহে মওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আগমন ঘটেছে তারই নবূওয়্যতের মোহর ধারণ করে। এই আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস যদি কুফর হয়, তাহলে আমি সেই কুফরকে প্রিয় মনে করি। কিন্তু, ঐ সকল লোক যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যাদেরকে নবূওয়্যতের নূর থেকে কোন অংশই দেওয়া হয়নি, তারা বিষয়টিকে অনুধাবন করতেই পারে না এবং একেই কুফুরী আখ্যা দান করে থাকে। অথচ, এটাই সেই সত্য, যার দ্বারা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহ ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণতা ও চিরজীবি হওয়া প্রমানিত হয়।' – (আল হাকাম, ১০ই জুন, ১৯০৫ পৃঃ২)।

(৩১)

'সমস্ত নবূয়্যত এবং সমস্ত কেতাবাদি যা অতীত হয়ে গেছে সেগুলিকে পৃথকভাবে মেনে চলবার প্রয়োজন আর নেই। কেননা, তা সবই এখন নবূয়্যতে মুহাম্মাদীয়ার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে এবং এই পথ ছাড়া বাকী সব পথই বন্ধ হয়ে গেছে। তামাম সত্যতা যা 'ফানা' পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়, তা সবই তার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। না তার

পরে আর কোন নতুন সত্যতা আসবে, না তার পূর্বেকার এরূপ কোন সত্যতা আছে যা তার মধ্যে শামিল নেই। এজন্যই, এই নবূয়্যতের মধ্যে তামাম নবুয়্যত খতম হয়ে গেছে এবং তা হওয়ারই ছিল। কেননা, যে জিনিষের সূচনা আছে তার পরিসমাপ্তি আছে। কিন্তু এই যে নবূয়্যতে মুহাম্মাদীয়া তা নিজস্ব ফয়েজ বা কল্যাণ বিতরণে অপর্যাপ্ত নয়, অপরাগও নয়। বরং সমস্ত নব্যুয়তের কল্যাণের চেয়ে এই নব্যুয়তের কল্যাণ অনেক অনেক বেশী। এই নবূয়্যতের আনুগত্য অনেক সহজেই খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। এবং এর আনুগত্যের মাধ্যমে খোদাতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁর বাণী ও সম্বোধনের পুরস্কার পূর্বের চাইতে অনেক বেশী করে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর পূর্ণ আনুগত্যকারী নিজেকে খাসভাবে শুধু নবী বলতে পারবে না; কেননা এতে করে মুহাম্মদীয় পরিপূর্ণ ও অখণ্ড নবূয়্যতের অবমাননা হয়। তবে হ্যাঁ, **উম্মতি** ও **নবী**-এই উভয় শব্দই একস্থিত অবস্থায় তার উপরে প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা, এতে করে মুহাম্মদীয় পূর্ণ ও অখণ্ড নবূয়্যতের অবমাননা হয় না, বরং এই নবূয়্যতের কৃপা ও কল্যাণের প্রভা আরও বেশী উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়।'

– (আল্ ওসিয়্যত, পৃঃ ১৭, ১৮)।

(৩২)

আমরা তো বলি যে, সেই ব্যক্তি কাফের যে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তের সামান্যতমও এদিক-সেদিক করে। আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে যে ঘাড় বাঁকায়, সে-ই যখন আমাদের কাছে কাফের, তখন আর সেই ব্যক্তির কী অবস্থা, যে কোন নতুন শরীয়ত আনয়নের দাবী করে অথবা কোরআন ও রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য ও রদবদল করে, অথবা কোন আদেশকে বাতিল বা মনসুখ মনে করে! আমাদের নিকটে তো ঐ ব্যক্তিই মুমিন যে কোরআন শরীফের সঠিক আনুগত্য করে এবং কোরআন শরীফকেই খাতামুল কুতুব বা কেতাবসমূহের মোহর বলে বিশ্বাস করে, এবং সেই শরীয়তকে যা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন, তাকে চিরস্থায়ী বলে মান্য করে, এবং তার মধ্য থেকে এক অণু পরিমানও-পরিবর্তন না করে; এবং তার অনুবর্তিতায় ফানা হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং আপন অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে এই পথে উৎসর্গ করে এবং কথায় ও কাজে, আচরণে ও বুদ্ধি-বৈভবে এই শরীয়তের বিরোধিতা না করে; তবেই তো সে সত্যিকার মুসলমান রূপে পরিগনিত হবে।' – (আল হাকাম, ৬ই মে, ১৯০৮, পৃ.৫)।

(৩৩)

'অধিকাংশ খৃষ্টান **'মাগফেরাত'**-এর প্রকৃত হকীকত বা তত্ত্বজ্ঞান অনুধাবন করতে না পারার কারণে মনে করে, যে ব্যক্তি মাগফেরাত কামনা করে সে অবাধ্য এবং পাপী হয়ে যায়। কিন্তু, মাগফেরাত শব্দটির উপরে গভীরভাবে চিন্তা করলেই পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, ফাসেক বা অবাধ্য এবং দুস্কৃতকারী সেই যে খোদাতায়ালার কাছে 'মাগফেরাত' প্রার্থনা করে না। কেননা, যেহেতু, প্রত্যেক সত্যিকারের পবিত্রতা তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া যায়, এবং তিনিই প্রবৃত্তিসমূহের তাড়নার তুফান থেকে রক্ষা করেন এবং নিস্পাপ রাখেন, সেহেতু খোদাতায়ালার সাধু বান্দাদের করণীয় এটাই যে, তারা

আগে থেকেই সর্বতোভাবে সেই প্রকৃত রক্ষাকারী ও অভিভাবকের নিকটে মাগফেরাত প্রার্থনা করে যাবে। আমরা যদি এই বস্তুজগতে মাগফেরাতের কোন নমুনা খোঁজ করি, তাহলে আমরা এর থেকে বড় আর কোন দৃষ্টান্ত পাব না যে, মাগফেরাত হচ্ছে ঠিক সেই রকম একটি মজবুত ও শক্ত বাঁধ যা নির্মান করা হয় প্লাবন ও তুফানকে প্রতিহত করবার জন্য। অতএব, যেহেতু, সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা খোদাতায়ালারই অধীন এবং যেহেতু, মানুষ দৈহিক দিক থেকে কমজোর, আত্মিক দিক থেকেও দুর্বল এবং তার জন্মগত স্বভাব-বৃক্ষের লালনের জন্য সব সময় সেই চিরন্তন সত্তার নিকটে পানির প্রত্যাশা করে, যার কল্যাণ ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়, সেহেতু ইস্তেগ্‌ফার-নিম্নোক্ত অর্থ অনুসারে-তার জন্য একান্তভাবে জরুরী এবং অপরিহার্য। যেমন কোন বৃক্ষ চতুর্দিকে তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে দেয়, সে তার চারিদিকের ঝরণা বা পানির প্রবাহের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং এই আবেদন জানায় যে, হে ঝরণা আমাকে সাহায্য কর, আমার সবুজ -সজীবতা যেন শুষ্ক হয়ে না যায়, আমার ফুল ধারনের সময় যেন নষ্ট হয়ে না যায়, ঠিক তেমনি অবস্থা হয় খোদাভীরু ব্যক্তিদেরও। রূহানী সজীবতাকে রক্ষা করার জন্য এবং নিরাপদ রাখার জন্য এবং সেই সজীবতাকে বৃদ্ধি করার জন্য হকীকি জিন্দেগী বা প্রকৃত জীবনের ঝরণা থেকে নিরাপত্তার পানি প্রার্থনা করাই হচ্ছে সেই বিষয়, যাকে অন্য কথায় কোরআন করীমে বলা হয়েছে 'ইস্তিগফার'। কোরআনকে গভীর ভাবে পড়ো এবং চিন্তা করো, ইস্তিগফারের প্রকৃত ও গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। আমি এখনই বর্ণনা করে এসেছি যে, আভিধানিক অর্থের দিক থেকে আবৃত করাকেই বলা হয় 'মাগ্‌ফেরাত'। কোন দুর্ভাগ্য বা কোন আপদ থেকে বাঁচাই যার উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পানি হচ্ছে বৃক্ষের জন্য একটি মাগফেরাতকারী উপাদান অর্থাৎ তা বৃক্ষের ত্রুটিসমুহকে আবৃত করে। একটু চিন্তা করে দেখো তো, যদি কোন বাগানের ভাগ্যে বছর দু'বছর একেবারেই পানি না জুটে, তাহলে তার চেহারাটা কেমন দেখাবে। কী, এটা কি ঠিক নয় যে, তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে? এবং তার সবুজ-সজীবতা নিঃশেষ হয়ে যাবে? এবং তার রূপরাশির নাম-নিশানাও থাকবে না? এবং সে কখনই আর সময়মত ফল দিতে পারবে না? এবং ভিতরে ভিতরে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে, এবং তাতে আর কোন ফুলও ফুটবে না? বরং, তার সবুজ সতেজ এবং নরম পেলব হলফল করা পাতাগুলো কয়েক দিনের মধ্যেই শুকিয়ে ঝরে পড়বে। এবং শুষ্কতা ছড়িয়ে পড়ে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আস্তে আস্তে একটি একটি করে খশে পড়া শুরু হবে। এই সমস্ত বালা-মুসিবত তার উপরে কেন নাযিল হবে? হবে এই জন্য যে, পানি যার উপরে তার জীবন নির্ভরশীল ছিল, তা তাকে সিক্ত করেনি। এদিকেই ইশারা করে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেছেন ঃ

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (পবিত্র বাক্য একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়। ১৪ঃ২৫)।

যেমন, কোন উত্তম বা মহৎ বৃক্ষ পানি ব্যতিরেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে না, সজীব ও সতেজ থাকতে পারে না, তেমনিভাবে, কোন সৎ ব্যক্তির পবিত্র বাক্যও যা তার মুখ থেকে নিসৃত হয় তাও সজীবতা দেখাতে পারে না এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না সে সেই পবিত্র স্রোতধারার সেই ইস্তিগ্‌ফারের প্রবাহ দ্বারা তার শিকড়গুলোকে সিক্ত করে। সুতরাং, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ইস্তিগফার-এর উপর

নির্ভরশীল, যার স্রোতধারার মধ্যে থেকে প্রকৃত প্রবাহ মানবিকতা বা ইনসানিয়াতের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এবং শুষ্ক হওয়া থেকে, মরে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে নেয়। যে ধর্মে এই দর্শনের কথা নেই, সেই ধর্ম নিশ্চয়ই খোদাতায়ালার নিকট থেকে আগত নয়। এবং যে ব্যক্তি, নবী বা রসূল কিংবা ধর্মপরায়ন বা পবিত্র জীবনের অধিকারী বলে দাবী করে, অথচ, এই ঝরণা থেকে মুখ ফেরায়ে রাখে, সেও নিশ্চয়ই খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে নয়। এবং এইরূপ ব্যক্তি খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে তো নয়ই, বরং সে শয়তানের পক্ষ থেকে নির্গত। কেননা, 'শায়ত' বলে মরে যাওয়াকে। সুতরাং, যে ব্যক্তি নিজের আধ্যাত্মিক বাগানকে সবুজ-সতেজ রাখার জন্য সেই প্রকৃত ঝরণাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চায় না এবং 'ইস্তিগফার'-এর সেই ঝরণার প্রবাহের দ্বারা ভরপূর করেনা, সেই ব্যক্তি শয়তান অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত। কেননা, এটা সম্ভব নয় যে, কোন সবুজ-সতেজ বৃক্ষ পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। প্রত্যেক অহংকারী, যে এই জীবনের নহর থেকে আপন রূহানী বৃক্ষকে সবুজ সতেজ রাখতে চায় না, সে শয়তান এবং শয়তানের মতই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এমন কোন সত্য নবী দুনিয়াতে আসেননি যিনি ইস্তিগফার-এর হকীকত বা তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুখ ফেরায়ে রেখেছেন, এবং হকীকি ঝরণা থেকে সবুজ ও সতেজ হতে চাননি। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক সবুজ ও সতেজ হতে চেয়েছেন যিনি তিনি হচ্ছেন আমাদের নেতা ও প্রভু খাতামুল মুরসালীন ফখরে আউয়ালীন ও আখেরীন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এইজন্য খোদা তাঁকে অন্য সকলের চাইতে অনুরূপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক সবুজ ও সতেজ করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক আতরসিক্ত বা সুঘ্রানময় করেছেন।

– (নূরুল কোরআন, নং ১, পৃ. ২৭-২৯)।

(৩৪)

'তাঁর (সাঃ) বরকতময় নামগুলির মধ্যে রহস্য এই যে, **মুহাম্মদ ও আহ্‌মদ** নামের যে দু'টি নাম, তার মধ্যে দু'টি চরম উৎকর্ষতা রয়েছে। **'মুহাম্মদ'**-নামের মধ্যে রয়েছে জালাল ও কিব্‌রিয়া অর্থাৎ মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্ব। এই নামের অর্থই হচ্ছে, অতীব উচ্চ স্তরের প্রশংসায় প্রশংসিত। এর মধ্যে এক প্রকার মাশুকানা রঙ বা প্রিয়জন হওয়ার রঙ রয়েছে। কেননা, প্রশংসা তো করা হয়, যে জন মাশুক তারই। অতএব, এর মধ্যে জালালী রঙ বা মহিমা, গৌরব ও প্রতাপের গুণ থাকা অপরিহার্য। কিন্তু, **'আহ্‌মদ'**-নামের মধ্যে রয়েছে আশেকানা রঙ বা প্রেমিক বা প্রেমিকার গুণ। কেননা, আশেক-এর কাজ হচ্ছে প্রশংসা করা। যে আপন মাহবুব ও মাশুকের–বন্ধু ও দয়িতের- প্রশংসা করে থাকে। এজন্যই, মুহাম্মদ নাম যেমন আপন মর্যাদার খাতিরে মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্বের বা জালাল ও কিব্‌রিয়ার প্রত্যাশী, তেমনি, 'আহমদ' নামও আপন আশেকানা মর্যাদার কারণে গরীবি ও নম্রতার আধার স্বরূপ। এর মধ্যে একটা রহস্য এটাই ছিল যে, তাঁর (সাঃ) জিন্দেগীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক হচ্ছে তাঁর (সাঃ) মক্কার জীবন, যার মেয়াদ কাল ছিল তের বছর, এবং দ্বিতীয় জিন্দেগী হচ্ছে তাঁর মদীনার জীবন যার মেয়াদ কাল দশ বছর। মক্কী জিন্দেগীতে তাঁর (সাঃ) আহ্‌মদ নামের গুণাবালীর তজাল্লী প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি (সাঃ) দিন রাত

খোদাতায়ালার সমীপে আকুল ভাবে কান্নাকাটি করেছেন, সাহায্য চেয়েছেন এবং সর্বক্ষণ প্রার্থনার মধ্যে থেকেছেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর (সাঃ) সেই জীবনের দিনগুলি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয় তাহলে সে দেখতে পাবে যে, তিনি (সাঃ) তাঁর মক্কী জীবনে যত আকুল প্রার্থনা ও কান্নাকাটির মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন, ততটা কখনই কোনও আশেক বা প্রেমিকা তার প্রিয়তম দয়িতের সন্ধানে করেনি, কেউ করতে পারবেও না। কিন্তু, তাঁর (সাঃ) এই আকুল চিত্তের রোনাজারি তাঁর নিজের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল দুনিয়ার অবস্থা জানার পর তারই জন্য। আল্লাহ্‌র এবাদতের নাম ও নিশানা তখন মুছে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে স্থিত আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ঈমানের কারণে যে আস্বাদ ও আনন্দ তিনি লাভ করেছিলেন, সেই আস্বাদ ও ভালবাসার সেই আনন্দ দ্বারা তিনি স্বভাবতঃই দুনিয়া বাসীকেও বিমোহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, দুনিয়াবাসীর অবস্থা তিনি যখন দেখতেন, তখন তাদের অযোগ্যতা ও তাদের স্বভাবের অবস্থা তাকে দারুন মুশকিলের মধ্যে ফেলতো, মুসীবতের সম্মুখীন করতো। তিনি দুনিয়ার এই অবস্থা দেখে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যেতেন। তিনি এজন্য এতো বেশী কষ্ট পেতেন যে, তাঁর জান যাওয়ার উপক্রম হতো। এদিকেই ইংগিতে করে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

'(সম্ভবতঃ, তুমি তোমার প্রাণকেই বিনাশ করে ফেলবে এইজন্য যে, তারা মুমিন (বিশ্বাসী) হচ্ছে না। ২৬ঃ৪)'।

এ ছিল তাঁর (সাঃ) অতি ব্যাকুল প্রার্থনার জীবন, এবং তাঁর 'আহ্‌মদ' নামের প্রকাশ। কিন্তু যে সময় এক অতি মহান আজিমুশ্‌শান লক্ষ্যের প্রতি তাঁর চিত্ত নিমগ্ন থাকতো, যার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মদীনার জিন্দেগীতে এবং তাঁর 'মুহাম্মদ' নামের তজল্লী প্রকাশিত হওয়ার সময়ে, তা জানা যায় এই আয়াত থেকে ঃ

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ 'এবং তারা বিজয় প্রার্থনা করলো, ফলতঃ, (সত্যের) প্রত্যেক স্বৈরাচারী শত্রু পরাভূত হলো। ১৪ঃ১৬।'

– (মালফুজাত, খ. ২, পৃঃ ১৭৮, ১৭৯)।

(৩৫)

যে ব্যক্তি কোরআন করীমের বাগ্‌ভঙ্গীর স্টাইল সম্পর্কে অবগত তিনি জানেন যে, কখনও কখনও সেই করীম ও রহীম জাল্লা শানুহু (আল্লাহ্‌তায়ালা) আপনার বিশেষ বান্দাদের জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা বাহ্যতঃ অবমাননাকর বলে প্রতীয়মান হলেও, আসলে প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে তা প্রশংসা জ্ঞাপক ও সম্মান সূচক। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁর নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

'এবং তিনি তোমাকে (তোমার আল্লাহ্‌র প্রেমে) আত্মহারা পেয়েছিলেন, এবং তিনি তোমাকে তাঁর নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। ৯৩ঃ৮।'

সাধারনতঃ, বিখ্যাত ও বড় বড় অভিধানগুলোতে, 'দাল্লা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ করা হয়েছে গোমরাহ্ বা বিপথগামী। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের আক্ষরিক ব্যাখ্যা

দাঁড়ায় এরকমঃ খোদাতায়ালা (হে রসূলুল্লাহ্!) তোমাকে গোমরাহ্ রূপেই পেয়েছিলেন, এবং পরে সৎপথে পরিচালিত করেছিলেন, হেদায়াত দান করেছিলেন। অথচ, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনই গোমরাহ্ বা বিপথগামী ছিলেন না। কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়ে কখনও এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনও কোন সময়ে গোমরাহীর কোনও কাজ করেছিলেন, তবে সেই ব্যক্তি কাফের, বেদ্বীন এবং সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। বরং, এই আয়াতের অর্থ এখানে তা-ই করতে হবে যা পূর্বাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে খাপ খায়। এবং তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু প্রথমে আঁহযরত (সঃ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

'তিনি কি তোমাকে এতীম পাননি এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেননি? এবং তিনি তোমাকে (তোমর আল্লাহ্র প্রেমে) আত্মহারাও পেয়েছিলেন, এবং তিনি তোমাকে তাঁর নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলেন। এবং তিনি তোমাকে অভাব-গ্রস্থও পেয়েছিলেন এবং তিনি তোমাকে সম্পদশালী করেছেন। ৯৩ঃ ৭-৯।'

অর্থাৎ, খোদাতায়ালা তোমাকে এতীম ও অসহায়রূপে পেয়েছিলেন, এবং নিজের কাছে জায়গা দিয়েছিলেন। এবং তোমাকে 'দাল্লা' (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেমে আশেক অবস্থায়) পেয়েছিলেন, তাই নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এবং তোমাকে তিনি গরীব পেয়েছিলেন, অতঃপর তোমাকে ধনী করেছিলেন।'

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ, ১৭০-১৭১)।

(৩৬)

'হযরত মুসা (আঃ) সহিষ্ণুতা ও নম্রতায় ইসরাঈলী নবীদের সকলের উর্ধ্বে ছিলেন। বনী ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে না মসীহ্ (আঃ), না অন্য আর কোন নবী এমন ছিলেন যে, যিনি হযরত মূসার উন্নত মর্যাদার সমান মর্যাদায় উপনীত হতে পেরেছিলেন। তৌরিত থেকে প্রমানিত হয় যে, হযরত মূসা সৌহার্দ্য, বিনয় ও উন্নত নৈতিকতায় অন্য সকল ইসরাঈলী নবী থেকে উত্তম ও উচ্চতর মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। যেমন, তৌরিতের গণনা পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিত আছে ঃ

'সদাপ্রভু শুনলেন। ভূমণ্ডলস্থ মানুষদের মধ্যে সকলের চাইতে মূসা লোকটি অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন।'

সুতরাং, খোদা তৌরিতের মধ্যে মূসার সহিষ্ণুতা বা মৃদুশীলতার এরূপ তারিফ করেছেন, যা ইসরাঈলী তামাম নবীদের মধ্য থেকে আর কারো জন্যই করেননি। আর কারো জন্যই এরূপ কথা বলেন নি। কিন্তু, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে অতি উন্নত চরিত্রের কথা কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, তা মূসার চাইতে হাজারো গুণ বেশী। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা বলেই দিয়েছেন যে, হযরত খাতামুল

আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরিত্র ছিল সেই সমস্ত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর সমবেত ও সমন্বিতরূপ, যা অপরাপর নবীদের চরিত্রে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যেত। এছাড়া, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে ঃ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ (নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপরে অধিষ্ঠিত। ৬৮ঃ৫।)

অর্থাৎ অত্যুন্নত চারিত্র্যের উপরে তোমার অবস্থান। 'আজীম' (অতীব মহান ও উন্নত) শব্দের দ্বারা যে জিনিষের প্রশংসা করা হয়, আরবী বাগধারায় তার চরম প্রশংসাকেই বোঝায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বলা হয় যে, এই বৃক্ষটি একটি আজীম বৃক্ষ, তাহলে এর অর্থ হবে, একটা বৃক্ষ উচ্চতায়, শাখা-প্রশাখার বিস্তারে এবং কাণ্ডে যতটা বিশাল হওয়া সম্ভব তা হয়েছে। তেমনিভাবে, এই আয়াতেরও তাৎপর্য এটাই যে, যতদূর পর্যন্ত একজন মানুষের পক্ষে উন্নত নৈতিক গুণাবলী, চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করা সম্ভব, তা সবই ছিল উৎকৃষ্টতম ও পূর্ণতমরূপে মুহাম্মদীয় সত্তার মধ্যে। সুতরাং, এই প্রশংসা এতো উন্নত স্তরের যে, তার চেয়ে বেশী প্রশংসা করাই সম্ভব নয়। এবং এদিকেই ইংগিত করে অন্য এক জায়গায় আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 'তোমার উপরে খোদার সর্বাপেক্ষা বেশী ফজল বা আশিস-অনুগ্রহ রয়েছে। ৪ঃ১১৪।' এবং অপর কোন নবীই তোমার স্তর পর্যন্ত পৌছুতে পারবে না। আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই প্রশংসাই ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে উল্লেখিত হয়েছে 'জেব্বুর' ৪৫ অধ্যায়ে, যেখানে বলা হয়েছেঃ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে আনন্দের তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন তোমার সঙ্গীগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে।' ৪৫ঃ৭। (বারাহীনে আহমদীয়া,পৃঃ ৫৮৩-৫৮৫, হাশিয়া ৩)।

(৩৭)

কোরআন শরীফ থেকে প্রমানিত যে, প্রত্যেক নবীই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেন ঃ

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ 'তোমরা নিশ্চয় তার উপরে ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' ৩ঃ৮২। সুতরাং, এই পন্থায়, তামাম আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম আঁযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মত হয়ে গেছেন।'

– (জামিমা বারাহীনে আহ্মদীয়া , খ. ৫. পৃ, ১৩৩)।

(৩৮)

'আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে সাল্লাম নিজের ভিতরে সমস্ত নবীদের নাম জমা করে রেখেছেন। কেননা, তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের কামালাত বা উৎকর্ষতা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং, তিনি মুসাও, তিনি ঈসাও, তিনি আদমও, তিনি ইব্রাহীমও, তিনি ইউসুফও, ইয়াকুবও (আলাইহিমুস সালাম)। এদিকেই ইশারা করে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেছেন ঃ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

'সুতরাং তুমি তাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর'। ৬ঃ৯১। অর্থাৎ, হে রসূল! তুমি তোমার নিজের সত্তার মধ্যে ঐ সমস্ত যাবতীয় হেদায়াতকে নিজের মধ্যে জমা করো, যা প্রত্যেক নবী বিশেষ করে নিজের সঙ্গে রাখতো। অতএব, এথেকে প্রমানিত হয় যে, সমস্ত নবীদের মর্যাদা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং সত্যিকার অর্থে, **'মুহাম্মদ'** নামের মধ্যেই (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সেই ইংগিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'মুহাম্মদ'-এর অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন প্রশংসা করা হয়েছে। এবং সীমাহীন প্রশংসার ব্যাপারটা কেবল তখনই কল্পনা করা সম্ভব, যখন নবীগণের পৃথক পৃথক উৎকর্ষতা এবং বিশেষ বিশেষ গুণ সবই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে একস্থে জমা হয়। কাজেই, কোরআন করীমের বহু আয়াতে-যেগুলির উল্লেখ এখানে প্রবন্ধকে দীর্ঘায়িত করবে-এরই প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। বরং সেগুলিতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা নিজস্ব গুণাবলী এবং উৎকর্ষতার কারণে সমস্ত নবীগণের সমবেতরূপ বা সমাবেশ ছিল। তাই, প্রত্যেক নবী তাঁর (আঃ) মধ্যে নিজের সত্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে এই ধারণাই পোষন করেছেন যে, 'আমার নামেই তাঁর আগমন হবে।' কোরআন করীমে একস্থানে বলা হয়েছে যে, এই নবী (সাঃ) সব চাইতে বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন ইব্রাহীমের (আঃ) সঙ্গে। ৩ঃ৬৯। বোখারী শরীফের এক হাদীসে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মসীহ্-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, এবং মসীহ্-এর সত্তাকে তাঁর সত্তার সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং, এই হাদীসে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর সেই কথারই সত্যায়ন বা তসদীক করা হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন যে, সেই নবীর আগমন হবে আমারই নামে। বস্তুতঃ, ঘটেছেও তাই। **আমাদের মসীহ্** সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন এলেন, তখন তিনি সেই মসীহ্ নাসেরী (আঃ)-এর যাবতীয় অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণতা দান করলেন, এবং তাঁর সত্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করলেন এবং সেই সমস্ত অপবাদ থেকে মুক্ত করলেন যা ইহুদী ও খৃষ্টানরা আরোপ করেছিল তাঁর উপরে এবং তিনি (সাঃ) এভাবেই মসীহ্ (আঃ)-এর আত্মাকে আনন্দিত করলেন।' – (আয়েনায় কামালাতে ইসলাম, পৃ, ৩৪৩)।

(৩৯)

'আল্লাহ্তায়ালার ওহী এমন এক আয়না যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্তায়ালার পারফেক্ট বা পরম উৎকৃষ্ট গুণাবলী দেখা যায়, এবং তা দেখা যায় ওহীপ্রাপ্ত নবীর বাতেনী বিশুদ্ধতা বা আভ্যন্তরীণ নির্মলতার অনুপাতে। যেহেতু, আঁহযর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাতেনী পবিত্রতায়, হৃদয়ের প্রসারতায়, নিষ্পাপ হওয়ায়, নম্রতায়, সততায়, বিশ্বস্ততায়, এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতায়, কৃতজ্ঞতায় এবং ভালবাসায়, প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সকল নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং উন্নত এবং পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ ছিলেন; সেহেতু আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে (সাঃ) বিশেষ উৎকর্ষতার বা খাস কামালাতের আতর দিয়ে সবার চাইতে বেশী করে অভিষিক্ত করেছেন। এবং সেই বক্ষ ও হৃদয়, যা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বক্ষ ও হৃদয় থেকে

অধিক প্রসারিত এবং পবিত্র এবং নিষ্পাপ এবং আলোকিত এবং প্রেমিক ছিল, তাকে এরূপ উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হলো যে, তার উপরে এমন ওহী নাযিল বা ঐশী কালাম অবতীর্ণ হলো যা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওহী থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং পূর্ণ এবং উন্নত এবং উত্তম। এবং সে কারণেই তা ঐশী গুণাবলী প্রদর্শনের নিমিত্তে এক স্বচ্ছ-সুনির্মল এবং প্রশস্ত এবং বৃহদাকার আয়না হয়ে গেল। সুতরাং, এটাই সেই কারণ, যেজন্য কোরআন শরীফে যে কামালাত বা পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা বিদ্যমান তার সামনে পুর্ববর্তী কেতাবগুলির দীপ্তি নিভু নিভু হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোন মন এমন কোন সত্যতাকে তুলে ধরতে পারবে না, যা এর মধ্যে পূর্ব থেকেই বিবৃত হয়নি । কোনও যুক্তি এমন কোনও তর্ক উপস্থাপন করতে পারবে না, যা পূর্ব থেকেই এর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়নি। কোন বক্তৃতা কোন হৃদয়ের উপর এমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, যেমন শক্তিশালী ও বরকতময় প্রভাব লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের উপর বিস্তার করে আসছে এই কিতাব। এবং ইহা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলীর এক অতীব স্বচ্ছ ও সুনির্মল আয়না যার মাধ্যমে সেই সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়, যা একজন সত্যান্বেষীকে মারেফাতের অতি উচ্চ স্তর সমূহে উপনীত করার জন্য প্রয়োজন।' – (সুরমা চশম আরিয়া পৃঃ ২৩, ২৪, পাদটীকা)।

(৪০)

'যেহেতু আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং রসুলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সর্বোন্নত ছিলেন, সেহেতু খোদাতায়ালার এই অভিপ্রায়ও ছিল যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেমন নিজস্ব সত্তার মনি-মুক্তোর নিরিখে বাস্তবিক পক্ষেই সকল নবীদের নেতা, তেমনিভাবে, প্রকাশ্য খেদমতের নিরিখেও তাঁর সকলের উপরে উন্নত ও উত্তম হওয়াটাও প্রকাশিত হোক, উদ্ভাসিত হোক। এজন্যই খোদাতায়ালা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সকল বনী আদমের জন্য সর্বাজনীনরূপে আবির্ভূত করেছেন, যাতে করে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সমূহ সার্বজনীনভাবেই প্রকাশিত হয়, এবং তা মূসা এবং ইবনে মরিয়মের মত বিশেষ একটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এবং তিনি সকল দিক থেকে সকল জাতির জুলুম ও নির্যাতন পোহাবার দরুন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের অধিকারী হবেন যা অন্য আর কোন নবীই লাভ করবেন না।' – (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ৬৩১, ৬৩২)।

(৪১)

'আমি বিশ্বাস করি যে, যদি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পৃথক করা যেত, এবং সমস্ত নবী যাঁরা ঐ সময় পর্যন্ত অতীত হয়ে গেছেন, তারা সবাই একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে সেই কাজ ও সেই সংশোধন করতে চাইতেন, যা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেছেন, তবে তা কিছুতেই করতে পারতেন না। তাঁদের মধ্যে সেই হৃদয় ও সেই শক্তি ছিল না, যা আমাদের নবীকে দান করা হয়েছিল। কেউ যদি বলে যে, এ তো নবীদের প্রতি (মায়াজ আল্লাহ্) দারুণ বেআদবী! তাহলে,

সেই নাদান বা মূর্খের পক্ষে অপবাদ আরোপ করা হবে আমার প্রতি। নবীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করাকে আমি আমার ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করি, কিন্তু, সকল নবীদের উপরে নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে আমার ঈমানের সর্বপ্রধান অঙ্গ, তা আমার শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। এবং তাকে আমি বের করে দেই, সে এখ্তিয়ার আমার নেই। হতভাগ্য ও দৃষ্টিহীন বিরুদ্ধবাদীরা যা খুশী বলতে পারে। তবে, (সত্য এটাই যে) আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেছেন, তা অন্যদের দ্বারা না পৃথক পৃথকভাবে, না সমবেতভাবে সমাধা হতে পারতো। এবং এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ঃ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ফজল বা কৃপা, তিনি যাকে চান দান করেন। ৬২ঃ৫

– (মালফুজাত, ক. ২,পৃঃ ১৭৪)।

(৪২)

'ইহুদীদের ধর্মীয় কেতাবসমূহে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের জন্য মুসার ন্যায় একজন পরিত্রাণকারীকে প্রেরণ করা হবে। অর্থাৎ তিনি এমন এক সময়ে আসবেন যখন ইহুদী জাতি ফেরাউনের যামানার মতই কঠিন লাঞ্ছনা-যন্ত্রনা ও দুঃখকষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে। তখন সেই পরিত্রাণকারীর উপরে ঈমান আনার ফলে তারা সেই যন্ত্রনা-লাঞ্ছনা ও দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবে। সুতরাং, সন্দেহ নেই যে, ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে যাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে ছিল তিনিই হচ্ছেন আমাদের নেতা ও প্রভু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁর মাধ্যমে তৌরিতের ভবিষ্যদ্বাণী অতি পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হয়েছে। কেননা, যখন ইহুদীরা ঈমান এনেছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে বড় বড় বাদশাহ্ খাড়া করা হয়েছিল। এবং এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে খোদাতায়ালা তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি রহম করেছিলেন। এবং এই অঙ্গীকারই দেওয়া হয়েছিল তৌরিতে।' – (আইয়ামুস সোলেহ্, পৃঃ৬৬-৬৯)

(৪৩)

'মসীহ্ (আঃ) কে যে মহত্ত্ব বা বুজরুগী দেওয়া হয়েছিল, তা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের তাবেদারী করার জন্যই দেওয়া হয়েছিল। কেননা, মসীহ্‌কে (আঃ) আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তার খবর দেওয়া হয়েছিল, এবং মসীহ্ আঁহযরত (সাঃ) এর উপরে ঈমান এনেছিলেন। এবং এই ঈমান আনার জন্যই মসীহ্ নাজাত লাভ করেছিলেন।'

– (আল হাকাম,৩০ জুন, ১৯০১,পৃঃ৩)।

(৪৪)

'হযরত মসীহ্ (আঃ) এবং হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লাম-এর প্রতি তাঁদের সমসাময়িক সরকারগুলো যে ব্যবহার করেছিল এবং এ ব্যপারে তাঁদের জন্য যে ঐশী মর্যাদা ও যে ঐশী সাহায্যের প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল

তার মধ্যে আমরা যখন তুলনা করি, তখন আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয় যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নবূয়্যতের মোকাবেলায় হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর খোদায়ী প্রদর্শন তো দূরের কথা, নবূয়্যতের মর্যাদা প্রদর্শনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন সমসাময়িক সম্রাটগণের নামে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তখন রোমান সম্রাট কায়ছার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমি তো খৃষ্টানদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় পড়ে আছি। আহা! আমি যদি এখান থেকে বের হবার কোন সুযোগ পেতাম, এবং তাঁর (সাঃ) খেদমতে হাজির হতে পারতাম, তাহলে, আমি গোলামদের ন্যায় তাঁর পবিত্র পদযুগল ধৌত করাকেই গৌরবের কাজ মনে করতাম। তবে, এক দুষ্ট চরিত্র ও নাপাক-হৃদয় বাদশাহ্, ইরানের খসরু, পত্র পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলো এবং আঁহযরত (সাঃ)-কে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈন্য প্রেরণ করলো। তারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে পৌঁছলো এবং বললো, আমাদের প্রতি হুকুম হলো, গ্রেফতার করার। তাদের এসব বেহুদা কথায় কান না দিয়ে আঁহযরত (সাঃ) বললেন 'ইসলাম কবুল করো'। ঐ সময়ে তিনি (সাঃ) দু'চার জন সাহাবী সহ মসজিদে বসা ছিলেন। কিন্তু, তাঁর (সাঃ) কথার ঐশী প্রভাবে সৈন্যরা কাঁপতে শুরু করলো। যাহোক, অবশেষে তারা বললো, আমাদের খোদাওন্দ্-এর যে হুকুম, অর্থাৎ গ্রেপ্তারী পরওয়ানা সম্পর্কে আপনার কি জবাব? আমরা আপনার সেই জবাব নিয়েই ফিরে যাব। হযরত নবীউল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল তোমরা জবাব পাবে। সকালে যখন তারা আবার হাজির হলো, তখন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যাকে খোদাওন্দ্ খোদাওন্দ্ বলছো সে তো খোদাওন্দ্ নয়। খোদাওন্দ্ হচ্ছেন তিনিই যাঁর উপরে মৃত্যু ও ধ্বংস প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। কিন্তু তোমাদের খোদাওন্দ্ আজ রাতে মারা গেছে। আমার সত্য খোদাওন্দ্ তার বিরুদ্ধে তার পুত্রকে নিযুক্ত করেছিলেন। এবং আজ রাতেই সে তার পুত্রের হাতে নিহত হয়েছে। এবং এটাই হচ্ছে জবাব। এ ছিল এক বিরাট মোজেজা, অলৌকিক নিদর্শন। । এবং এই নিদর্শন দেখে সে দেশের হাজার হাজার লোক ঈমান এনেছিল। কেননা, বাস্তবিকই, ঐ রাতে খসরু পারভেজ অর্থাৎ কিস্‌রা নিহত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, এই কথা ইঞ্জিলের কোন অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন কথার মত নয়। বরং, সহীহ্ হাদীস, ঐতিহাসিক প্রমাণ, এমনকি বিরুদ্ধবাদীদের সাক্ষ্য-স্বীকৃতি দ্বারাও প্রমানিত। মিঃ ডেভনপোর্টও এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর পুস্তকে।

পক্ষান্তরে, সমসাময়িক বাদশাহ্দের সামনে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর যে ইজ্জত-সম্মান ছিল, তাও সকলের জানা। সম্ভবতঃ, আজও অব্দি ইঞ্জিলে সেই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যে, হিরোডিয়াস পীলাতের আদালতে মসীহ্‌কে (আঃ) আসামীরূপে চালান করেছিল। এবং তিনি কিছুদিন হাজতবাসও করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর খোদায়ীর কোন নিদর্শন দেখাতে পারেননি। এবং অন্য কোনও বাদশাহ্ও এমন কথা বলেনি যে, তাঁর সেবা করতে পারলে এবং পা ধুয়ে দিতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। বরং, পীলাত তাঁকে ইহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কী! এটাই কি তাঁর

খোদায়ী ছিল? কত বিশাল ও বিস্ময়কর পার্থক্য! উভয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, পরিনতি উভয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা প্রমানিত হয়েছে। একজনের ক্ষেত্রে, এক উদ্ধত ও অহংকারী সম্রাট শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে পরিণামে আল্লাহ্‌র অভিশাপে গ্রেফ্‌তার হয়েছে এবং আপন পুত্রের হাতে লাঞ্ছনার সাথে নিহত হয়েছে। অপর জনের ক্ষেত্রে, যাঁকে তাঁর অনুসারীরা তাঁর আসল দাবীকে পরিত্যাগ করে অহেতুক বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আকাশে উঠায়ে রেখেছে, তিনি সত্যি সত্যিই গ্রেফ্‌তার হয়েছিলেন, চালানও হয়ে ছিলেন। এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জালেম পুলিশের হাওয়ালায় এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রেরিত হয়েছিলেন।'

– (নুরুল কোরআন, নং ২, পৃ, ৯-১১)।

(৪৫)

'এক যামানা ছিল, যখন ইঞ্জিলের ওয়াজকারী বা প্রচারকারীরা হাটে-বাজারে, অলিতে-গলিতে, গঞ্জে-গ্রামে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য সহকারে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকরূপে এবং নির্জলা মিথ্যা দোষারোপ করে আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা, খাতামুল আম্বিয়া, আফজালুর রুসুল, আফ্‌জালুল আসফিয়া, সাইয়্যেদুল মাসুমীন, সাইয়্যেদুল মুত্তাকীন আল্লাহ্‌র মাহবুব মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নির্লজ্জভাবে এই মিথ্যা প্রচার চালাতো যে, তাঁর স্বপক্ষে কোন ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হয়নি কিংবা কোন মোজেজা বা নিদর্শনও প্রদর্শিত হয়নি। কিন্তু, এখন আর এক যামানা এসেছে, যখন খোদাতায়ালা-সেই হাজার হাজার মোজেজা যা আমাদের নেতা ও প্রভু শফীউল মুযনবীন সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কোরআন শরীফ ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত উঁচু স্তরের মর্যাদা সম্পন্ন সেগুলি ছাড়াও, সর্বদা এমন তাজা তাজা নিদর্শণ প্রকাশিত করে চলেছেন যে, কোন বিরুদ্ধ বাদী ও অস্বীকারকারীর ক্ষমতা হবে না তার মোকাবেলা করার। আমরা অত্যন্ত নম্রতার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যেক খৃষ্টান এবং অন্যান্য বিরোধীদেরকে বলে এসেছি এবং এখনও বলছি যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই তো সত্য যে, প্রত্যেক ধর্ম যা খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে আপন সত্যতার উপরে কায়েম হয়, তার জন্য এটা জরুরী যে, তার মধ্যে এমন সব মানুষ জন্মগ্রহণ করতে বা তৈরী হতে থাকবে যারা তাদের নিজেদের নেতা ও হাদী বা পথ-প্রদর্শক রসূলের নায়েব বা ডেপুটি হিসেবে সাব্যস্ত করবে যে, সেই নবী তাঁর নিজের রূহানী বরকতসমূহের বা আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহের দিক থেকে জিন্দা রয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেননি। কেননা, এটা অত্যাবশ্যক যে, সেই নবী, যাঁর আনুগত্য করা হবে, যাঁকে শাফায়াতকারী ও পরিত্রাণদাতারূপে গ্রহণ করা হবে, তিনি তাঁর রূহানী বরকতসমূহের দিক থেকে সর্বদা জীবন্ত থাকবেন। তিনি সম্মান, মর্যাদা, গৌরব ও প্রতাপের সঙ্গে আসমানে আপনার দীপ্তিমান চেহারাসহ সুস্পষ্টরূপে অবস্থান করবেন। তিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, সর্বশক্তিমান ও সর্বক্ষমতার অধিকারী খোদাতায়ালার ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। তাঁর এই অবস্থানে জোরালো ইলাহী - আলোর দ্বারা প্রমানিত হবে যে, তাঁর সঙ্গে গভীর ভালবাসা করলে তাঁর পূর্ণ অনুবর্তিতা

করলে অনিবার্যরূপে এই ফল দেখা দিবে যে, আনুগত্যকারী রুহুল কুদ্দুস বা পবিত্র আত্মা এবং আসমানী বরকতসমূহের এনআম বা পুরস্কার লাভ করবে। এবং আপনার প্রিয় নবীর আলোরাশি থেকে আলো প্রাপ্ত হয়ে আপন যুগের অন্ধকার দূরীভূত করবে। এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন পোক্ত এবং পূর্ণ এবং আলোকিত এবং দেদীপ্যমান দৃঢ় ঈমান দান করবে, যার ফলে পাপের সকল ইচ্ছা-প্রবনতা এবং ইতর জীবনের যাবতীয় তাড়না ও জজ্‌বা জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে সেই সত্যের প্রমাণ যে, সেই নবী জিন্দা এবং তিনি আসমানে অবস্থান করছেন। অতএব, আমরা সকল শক্তি, ক্ষমতা, গৌরব ও প্রতাপের অধিকারী জুল-জালাল খোদার কৃতজ্ঞতা কী করে করবো যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয় নবী মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ভালবাসবার এবং তাঁর আনুগত্য করবার তৌফিক বা সামর্থ্য ও সুযোগ দিয়েছেন, এবং সেই ভালবাসা এবং আনুগত্যের রূহানী ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমূহ যা প্রকৃত তাকওয়া বা খোদাভীরুতা ও সত্যিকার আসমানী নিদর্শন, তা থেকে যথেচ্ছরূপে দান করে আমাদের উপরে প্রমান করে দিয়েছেন যে, আমাদের সেই প্রিয় পছন্দের মহিমান্বিত নবী মৃত্যুবরণ করেননি। বরং, তিনি (সাঃ) অতি উচ্চ আসমানে সর্বশক্তিমান সম্রাটের ডান পার্শ্বে তাঁর মহিমাময় ও গৌরবময় সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। হে আল্লাহ! তাঁর উপরে আশিস ও কল্যাণ বর্ষণ কর, বরকত ও মঙ্গল বর্ষণ কর, শান্তি বর্ষণ কর।

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত অবতীর্ণ করছেন, এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগনও তার জন্য রহমত প্রার্থনা করছে। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত প্রার্থনা কর (দরূদ পাঠ কর) এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। ৩৩ঃ৫৭।)

এখন, কেউ পারলে আমাদেরকে জবাব দিক যে, এই পৃথিবীর বুকে এইরূপ জীবনের অধিকারী হওয়া আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কোন্ সে নবীর জন্য প্রমানিত হয়? হযরত মূসার (আঃ) জন্য? কখ্‌খনো নয়। হযরত দাউদের (আঃ) জন্য? কখ্‌খনো নয়। হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর জন্য? কখ্‌খনো নয়। রাজা রামচন্দ্র অথবা রাজা শ্রীকৃষ্ণের জন্য? কখ্‌খনো নয়। বেদ-এর সেই সমস্ত ঋষীদের জন্য যাদের পক্ষে বলা হয় যে ,তাদের হৃদয়ের উপরে বেদ-এর প্রকাশ হয়েছিল? কখ্‌খনো নয়। পার্থিব জীবনের কথা বলা তো অর্থহীন। প্রকৃত এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণমণ্ডিত জীবন তো সেই জীবন, যা খোদাতায়ালার জীবনের (গুণাবলীর) সাদৃশ্য হয়ে নূর ও ইয়াকীনের, আলো ও দৃঢ় বিশ্বাসের নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম। তা না হলে, পার্থিব জীবনে দীর্ঘায়ূ লাভ করা যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাউকে যদি তেমন দীর্ঘায়ু দান করা হয়, তাতে গৌরবের কিছু নেই। মিশরের বহু ইমারততো হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। ব্যাবিলনের অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলোতে এখন পেঁচা চামচিকের বাস। এদেশেও অযোধ্যা ও বৃন্দাবনের মত সেকালের শহর রয়েছে। ইতালী ও রোমেও

প্রাচীনকালের দালান-কোঠা দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে কি বলতে হবে যে, প্রাচীন কাল থেকে টিকে থাকার কারণে এই সমস্ত ইমারতেরও সেই গৌরব ও মর্যাদা লাভ হয়ে গেছে, যা লাভ করে থাকেন রূহানী জিন্দেগীর কারণে খোদার প্রিয় ও পবিত্র বান্দারা ? অতএব, বিষয়টি এখন ফয়সালা হয়ে গেছে যে, আধ্যাত্মিক জিন্দেগীর প্রমান শুধু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মঙ্গলময় সত্তার মধ্যেই পাওয়া যায়। এবং খোদাতায়ালার হাজারো হাজারো অগনিত রহমত তাঁর সঙ্গে রয়েছে।'

– (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃ, ৯, ১০)।

(৪৬)

'আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তিন সহস্রাধিক মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছিলেন। আর ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যার তো কোন সীমাই নেই। কিন্তু, আমাদের প্রয়োজন নেই যে, আমরা ঐ সমস্ত অতীত মোজেজার বিবরণ দেই। বরং, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি অতি মহান বা আজিমুশ্‌শান মোজেজা এই যে, সমস্ত নবীগণের ওহী বাদ পড়ে গেছে এবং তাঁদের মোজেজাগুলিও পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, এবং তাঁদের উম্মতরাও খালি হাতে বসে আছে এবং তাদের হাতে এখন আছে শুধু কেচ্ছা আর কাহিনী। কিন্তু, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওহী বাদ পড়েনি তাঁর মোজেজাগুলিও পরিত্যক্ত হয়নি। বরং সর্বদা উম্মতের কামেল ব্যক্তিগণের, যাঁরা তাঁর আনুগত্যের বদৌলতে সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই কারণে **ইসলাম ধর্ম একটি জীবন্ত ধর্ম, এবং তাঁর খোদা জীবন্ত খোদা।** বস্তুতঃ, এই যামানাতেও সেই সাক্ষ্য পেশ করার জন্য আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের এই বান্দা উপস্থিত রয়েছে। এবং আজ পর্যন্ত আমার হাতেও রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এবং কিতাবুল্লাহ্‌র সত্যতা প্রদর্শনের পক্ষে হাজারো নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এবং প্রায় প্রতিদিন আমি খোদাতায়ালার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হই।' – (চশমা মসীহি, পৃ, ১৮, প্রথম সংস্করণ)।

(৪৭)

'এই **'লেকা'** বা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সাক্ষাতের স্তরে মানুষের দ্বারা কোন কোন সময় এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে যা মানবীয় সমস্ত শক্তির উর্ধ্বে বলে প্রতীয়মান হয়। এবং তার মধ্যে তখন ঐশী শক্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের নেতা ও প্রভু সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত খাতামুন্নবীঈন সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে **এক মুষ্ঠি বালুকণা নিক্ষেপ** করেছিলেন কাফেরদের প্রতি। এবং সেই বালুমুষ্ঠি তিনি কোন দোয়ার মাধ্যমে নিক্ষেপ করেননি, করেছিলেন নিজস্ব রূহানী শক্তির বলে। কিন্তু তবু, ঐ এক মুষ্ঠি বালুকণায় খোদায়ী শক্তি প্রকাশিত হয়েছিল। এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের উপরে তার এমন অস্বাভাবিক ও অসাধারন প্রভাব পড়েছিল যে, এমন একজনও বাকী ছিল না যার চোখের মধ্যে তার আঘাত লাগেনি। এবং তারা সবাই অন্ধের মত হয়ে পড়েছিল। তারা ভীত -আতংকিত ও দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে

যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পাগলের মত ছুটে পালাচ্ছিল। এই সেই মোজেজা যার প্রতি ইংগিত করে কোরআন করীমে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ 'যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন। ৮ঃ১৮।'

অর্থাৎ, তুমি যখন সেই বালুমুষ্ঠি নিক্ষেপ করেছিলে, তা তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং খোদাতায়ালাই নিক্ষেপ করেছিলেন। অন্য কথায়, পর্দার অন্তরালে খোদায়ী শক্তিই কাজ করেছিল, নইলে মানবীয় শক্তির কী সাধ্য যে, এই কাজ করে!

আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুরূপ দ্বিতীয় মোজেজা হচ্ছে **'শাক্কুল কমর'**-চন্দ্র দিখণ্ডিত করণ। এই অলৌকিক নিদর্শনও প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁর (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির বলে। কোন দোয়া ছিল না এর সঙ্গে। কেননা, তা স্রেফ এক অঙ্গুলি ইশারাতেই সংঘটিত হয়েছিল, এবং ঐ অঙ্গুলি ছিল তখন খোদায়ী শক্তিতে ভরপূর। এ রকম বহু মোজেজা প্রদর্শিত হয়েলি তাঁর (সাঃ) দ্বারা, যেগুলি সংঘটিত হয়েছিল তাঁর (সাঃ) নিজের ক্ষমতার বলেই, কোন দোয়া সেগুলির মধ্যে শামিল ছিল না। কয়েক বার সামান্য পরিমান পানি, যা একটা মাত্র পেয়ালার মধ্যেই ছিল, তার মধ্যে তাঁর (সাঃ) আঙ্গুলিগুলি ডুবিয়ে দিয়ে তা পরিমানে এতো বেশী বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে, সেই পানি সেনাবাহিনীর সব লোক, উট, ঘোড়া পান করার পরেও দেখা গেছে, তা পরিমানে আগের মতই রয়ে গেছে। কয়েকবার দু'চারটা রুটির উপরে নিজের হাত রেখে সেই রুটির দ্বারাই হাজারো ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মানুষকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছেন। কোন কোন সময় সামান্য পরিমান দুধে নিজের ঠোট ছুঁইয়ে দিয়ে সেই বরকতে, তা একদল মানুষকে পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। কোন কোন সময় ময়লা পানির কূয়ার মধ্যে নিজের মুখের থু থু ফেলে সেই পানিকে একেবারে পরিষ্কার ও সুপেয় করে দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো সাংঘাতিক ভাবে জখমী লোকদের গায়ে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করে তুলেছেন। অনেক সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে বেরিয়ে পড়া চক্ষুকে নিজ হাতের বরকতে যথাস্থানে বসিয়ে ভাল করে দিয়েছেন। এইভাবে, তিনি (সাঃ) এমন এমন অসংখ্য কাজ নিজের ক্ষমতার বলে করেছেন যেগুলির মধ্যে নিহিত ছিল খোদায়ী শক্তি।

আজকের দিনের ব্রাহ্মরা কিংবা দার্শনিকরা বা প্রকৃতির পূজারীরা যদি এই সকল মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শনকে অস্বীকার করে, তবে তারা তা করতে পারে তাদের অজ্ঞতার কারণে। কেননা, তারা সেই মর্যাদা বা মর্তবাকে সনাক্ত করতে পারে না যার ফলে মানুষ ঐশী ক্ষমতা জিল্লীভাবে বা প্রতিবিম্বাকারে লাভ করতে পারে। যদি তারা এ বিষয়ে হাসি-ঠাট্টাও করে, তবু তাদেরকে মাফ করা যায়। কেননা, তারা তাদের বালসুলভ অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করতে পারেনি; তারা কোন প্রকারের কোন আধ্যাত্মিক স্তরেই উন্নীত হয়নি। তারা তাদের অবস্থা শুধু বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্তই করেনি, বরং তাদের সেই বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থাতে তারা মরতেও খুশী।

কিন্তু, বড়ই আফসোস ঐ সমস্ত খৃষ্টানদের জন্য যারা অনুরূপ, বরং তার চেয়েও নীচু স্তরের। কোন কোন ঘটনা হযরত মসীহ্ (আঃ) এর ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়ার কথা শুনে শুনে সেগুলোকে উলুহিয়াৎ বা ঈশ্বরত্বের প্রমান বলে মেনে নিয়েছে, এবং বলে বেড়াচ্ছে যে, মসীহ্ কতৃক মৃতকে জীবিত করা এবং খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা তাঁর নিজস্ব শক্তির বলেই সাধিত হয়েছিল; এসবের মধ্যে কোন প্রার্থনা ছিল না। এবং এটাই নাকি প্রমাণ যে, তিনি সত্যি সত্যিই খোদার পুত্র ছিলেন, বরং খোদা-ই ছিলেন। কিন্তু, আফসোস যে, এই বেচারাদের কোন খবরই নেই যে, যদি এই সমস্ত কারণেই মানুষ খোদা হয়ে যেতে পারে, তাহলে, ঐ খোদায়ীর চেয়ে অনেক বড় খোদায়ীর অধিকারী হবেন আমাদের নেতা ও প্রভু নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। কেননা, যে ধরনের অসামান্য অলৌকিক নিদর্শন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন, তা হযরত মসীহ্ আলাইহেস সালাম কোন ক্রমে কখনই দেখাতে পারেননি। আমাদের সৎ-পথ প্রদর্শক ও পরিচালক-হাদী ও মুক্তাদা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই প্রকারের অলৌকিক ঘটনাবলী, না শুধু নিজেই সংঘটিত করে দেখিয়েছেন, বরং তার একটা দীর্ঘ ধারাবাহিকতা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে জারি করে দিয়ে গেছেন, যা কিনা সর্বদা এবং প্রত্যেক যামানায় সেই যামানার প্রয়োজন মোতাবেক প্রকাশিত হয়ে এসেছে। এবং তা এই দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত একইভাবে প্রকাশিত হতে থাকবে। খোদায়ী শক্তির চাপ ও প্রভাব এই উম্মতের পবিত্র আত্মাসমূহের উপরে যত তীব্রভাবে পতিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত অপর কোন উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা কত বড় নির্বুদ্ধিতা যে, এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনার জন্যই এক ব্যক্তিকে খোদা অথবা খোদার বেটা বলে চিহ্নিত করা হবে? যদি এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর কারণেই মানুষ খোদা হয়ে যায়, তাহলে তো আর খোদার সংখ্যার কোন সীমা-পরিসীমাই থাকবে না।'

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ. ৬৫-৬৭)।

(৪৮)

'আমরা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে,'শাক্কুল কমর' বা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ -এর মোজেজাটি মুসলমানদের কাছে এমন কোন বিষয় নয় যাকে তারা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ এবং কালামুল্লাহ্ বা কোরআন করীমের পক্ষে প্রধান যুক্তি হিসেবে খাড়া করে থাকে। বরং এটা হাজারো আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণ এবং হাজারো মোজেজা ও নিদর্শনের মধ্যে মাত্র একটা প্রাকৃতিক নিদর্শন এবং তা যে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারাই সাব্যস্ত তা আমরা একটু পরেই পেশ করবো। সুতরাং, সমস্ত প্রকাশ্য প্রমানাদিকে উপেক্ষা করেই আমরা যদি মেনে নিই যে, এই মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাটি প্রমানিত নয়, এবং সেই সঙ্গে আয়াতের সেইরূপ অর্থই করি যেরূপ করে থাকে আজকালকার খৃষ্টানরা, প্রকৃতি-পূজারীরা এবং অনুরূপ ঘটনাবলীর অস্বীকারকারীরা -------তবু, এতে ইসলামের সত্যতার কিছু যায় আসবে না। সত্য তো এটাই যে, কালাম-এ-ইলাহী অর্থাৎ **কোরআন শরীফ স্বয়ং মুসলমানদেরকে অপর আর কোন মোজেজার**

উপরে নির্ভর করা থেকে মুক্ত করেছে। এ শুধু স্বয়ং মোজেজাই নয়, বরং এ তার আপনার কল্যাণরাজি ও আলোকরাশির দ্বারা মোজেজার সৃষ্টি করেও থাকে। বস্তুতঃ কোরআন শরীফ তার নিজের মধ্যে এতো উচ্চ স্তরের গুণাবলী রাখে যে, তার জন্য অন্য আর কোন বাহ্যিক মোজেজার আদৌ প্রয়োজন হয়না। বাহ্যিক মোজেজা থাকলেও তার বড় একটা যায় আসেনা, না থাকলেও যায় আসে না। তার সৌন্দর্যকে বাহ্যিক মোজেজার বা অলৌকিক নিদর্শনের অলংকার দিয়ে সজ্জিত করার প্রয়োজন হয় না বরং, তার নিজের মধ্যেই রয়েছে হাজারো আশ্চর্য ও বিস্ময়কর মোজেজা, যা প্রত্যেক যামানাতেই লোকেরা দেখতে পায়, যা কেবল অতীতের ঘটনাবলীই নয়। এ এতো সুন্দর প্রিয়তম যে, সব কিছুই এথেকেই সৌন্দর্য আহরণ করে, এবং এর নিজের কোন প্রয়োজনই হয় না অন্যের কাছ থেকে সৌন্দর্য আহরণ করবার-------, এছাড়া, একথাও বুঝতে হবে যে, যারা 'চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ' মোজেজার উপরে আক্রমন চালায়, তাদের কাছে মাত্র একটা অস্ত্রই আছে, সেটাও আবার ভাঙ্গা-ভোতা। এবং সেটা হচ্ছে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ ব্যাপারটা নাকি প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। এজন্য, এটাই উচিত হবে যে, প্রথমে ওদের ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করা; অতঃপর সেই সমস্ত ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণ পেশ করা যাতে প্রমানিত হবে যে, ঐ ঘটনা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, এও জানা দরকার যে, প্রকৃতিকে মান্যকারীরা অর্থাৎ কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়ম-এর আনুগত্যকারীরা, এই ধারনার উপরে জোর দিয়ে থাকে যে, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ তার যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যতটা জানতে পারে, তা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়া কিছু নয়। সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান সবকিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে চতুর্দিকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, সব কিছুই তা সে ভৌতিক বা অভৌতিক যা-ই হোক না কেন, এবং আমাদের আশে পাশে উপরে-নীচে যেখানেই থাকুক না কেন, সব কিছুই আপন অস্তিত্বের দিক থেকে এবং টিকে থাকার বা উত্তরণের দিক থেকে একটা বিস্ময়কর ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত। এবং তা সব কিছুর মধ্যে সহজাত এবং কোনমতেই তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। প্রকৃতি যাকে যেভাবে এবং যে আকারে ও উদ্দেশ্যে তৈরী করতে চেয়েছে তা নিখুঁতভাবে তেমনিই হয়েছে। এবং হবেও। সুতরাং, সেটাই সত্য এবং নীতিগতভাবেও সেটাই সঠিক, যা এই নিয়মের মধ্যে সংঘটিত হবে।

আমার কথা হচ্ছে, মানলাম না হয়, এ সব কিছুই ঠিক আছে। কিন্তু, এতেই কি প্রমানিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সব পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম, যা আমরা আমাদের পর্যবেক্ষন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে বা বুঝতে পেরেছি, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার বাইরে আর কিছুই নেই? যখন, ঐশী ক্ষমতাকে সীমাহীন বলে স্বীকার করা অপরিহার্য এবং যা সমস্ত ঐশী ব্যবস্থার ধর্ম এবং মূল, যার সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল; তখন এই অযৌক্তিক তর্ক উপস্থাপন করাটা নিশ্চয়ই একটা বিরাট ভুল যে, যা আমাদের দেখা-শোনা ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে তা প্রকৃতির নিয়মেরও বাইরে। বরং, যখন আমরা আমাদের নিজেদের মুখেই স্বীকার করি যে, প্রকৃতির নিয়মাবলীর কোন শেষ নেই, সীমা নেই, তখন আমাদের নীতি এটাই হওয়া উচিত যে,

কোন নতুন কিছু দেখা মাত্রই, এবং তা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে হলেও, তাকে চট্ করে অস্বীকার না করা, এবং তার প্রমানিত হওয়া বা না-হওয়াকে যাচাই করে দেখা এবং যদি তা প্রমানিত হয়, তবে তাকে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। এবং যদি তা প্রমানিত না হয়, তবে শুধু এতটুকু বলে দেওয়া যে, প্রমানিত নয়। তাই বলে আমরা এটা বলবার অধিকার রাখি না যে, বিষয়টা কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত। কেননা, প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরের কোন বিষয়কে বুঝতে হলে আমাদের জন্য প্রয়োজন হবে, একটা বৃত্তের আকারে খোদাতায়ালার চিরন্তন সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে বেষ্টন করে ফেলা এবং খোদাতায়ালা আদ্দিকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাঁর যে সমস্ত কুদরৎ বা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী প্রকাশিত করেছেন সেগুলিকে নিজেদের বুদ্ধির আওতায় নিয়ে আসা, এবং আগামীতে অনন্ত কাল ধরে যা কিছু প্রকাশিত করতে থাকবেন তাও বুদ্ধির আওতার মধ্যে এনে ফেলা-------- যাহোক, আমরা যদি স্বীকার করি যে, খোদাতায়ালার ক্ষমতাসমূহ অসীম, তাহলে তাঁর ক্ষমতাসমূহকে পরিবেষ্টন করার ইচ্ছা পোষণ করাটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। কেননা, তা যদি আমাদের পর্যবেক্ষনের পরিধির মধ্যে স্বীমাবদ্ধ হয়েই পড়ে তাহলে তা আর কী করে অসীম ও অন্তহীন থাকবে? এমনটি হলে তো কেবল এই ক্রটিই দেখা যাবে না যে, আমাদের স্বল্প এবং অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যেই অনন্ত অসীম খোদার যাবতীয় ক্ষমতাবলী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে; বরং তারও চেয়ে অনেক বেশী বড় একটা ক্রটি দেখা দিবে, এবং তা হচ্ছে, খোদার ক্ষমতাসমূহ সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে খোদ খোদাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এবং তখন একথা বলা যাবে যে, খোদাতায়ালার হকীকত ও রহস্য সব আমরা জেনে ফেলেছি এবং তাঁর গভীরতার অন্তস্তল পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। বলা বাহুল্য, এই কথার মধ্যে যত বড় কুফরী, বেআদবী এবং বেঈমানী নিহিত তা এমনিতেই সুস্পষ্ট, তাকে আর ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।'

– (সুরমা চশম আরিয়া, পৃ. ১৬, ১৭)।

(৪৯)

'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এই কথা সাধারণভাবে এবং প্রকাশ্যে প্রচার করে থাকেন যে, তাঁরই আঙ্গুলি হেলনে চন্দ্র দিখণ্ডিত হয়েছিল, যা কাফেররা নিজেদেরই চক্ষে দেখেছিল, এবং সেই ঘটনাকে যাদু বলেও আখ্যায়িত করেছিল এবং তাঁর সেই কথাটা যদি সত্য না হয়ে থাকে, তাহলে, আঁহযরত (সাঃ)-এর সেই বিরুদ্ধবাদীরা, যারা সেই সময়ে বর্তমান ছিল এবং এই খবর যথারীতি অবগত হয়েছিল, তারা কেন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করলো না যে, কখন আপনি চন্দ্র দিখণ্ডিত করলেন, কখন আমরা তাকে যাদু বললাম, আর কখনই বা তা আমরা অস্বীকার করলাম? আর কেনই বা তারা আমরণ নীরবতা পালন করেছিল এবং মুখ বন্ধ করে রেখেছিল এবং সেভাবেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল? তাদের এই নীরবতা, যা তাদের বিরোধী অবস্থা এবং তাদের মোকাবেলা করবার জোশ-উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন, তা কি এই কথার

নিশ্চয়তা দেয় না যে, এমন কোন একটা বাধা ছিল যার দরুন তারা কোন কথাই বলতে পারছিল না? এবং সেই বাধাটা বস্তুতঃ ঘটনার সত্য হওয়া ছাড়া আর কি? এই মোজেজা প্রদর্শিত হয়েছিল মক্কায়। মুসলমানরাও ছিল তখন খুবই দুর্বল, দরিদ্র ও অসহায়। তবু, আশ্চর্য যে, বিরুদ্ধবাদীদের ছেলেরা এবং নাতিরা পর্যন্ত এর বিপক্ষে কোন কথাই বলেনি। অথচ, তাদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য ছিল যে, এতো বড় একটা দাবী, তা যদি মিথ্যাই হয়ে থাকতো এবং যা কিনা শত শত ক্রোশ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে মিথ্যা প্রমানিত করার জন্য কেতাব-পুস্তক লেখা এবং সেগুলোকে প্রকাশ ও প্রচার করা। যেহেতু, ঐ সব লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান, আরবী, ইহুদী, মাজুসী ইত্যাদির মধ্য থেকে কারো পক্ষেই তার বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখবার সাহস হয়নি; এবং যেহেতু মুসলমানরা হাজারো মানুষের সামনে প্রকাশ্যে চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রমাণ প্রচার করে যাচ্ছিল, এবং সেই যামানার কিতাব-পুস্তকে তাদের সেই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান লিপিবদ্ধও হয়েছিল এবং যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়; সেহেতু, এটাই পরিষ্কার প্রমাণ যে, বিরুদ্ধবাদীরাও নিশ্চয়ই 'শাক্কুল কমর'-চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ-এর ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিল। কাজেই, একে রদ বা বাতিল করার জন্য কোন কিছু লিখবার কোন অবকাশই ছিলনা তাদের পক্ষে। -------- এসব কথার পর আমরা আরও একটি কথার উল্লেখ করতে চাই, হিন্দুদের বিশ্বস্ত পুঁথি-পুস্তকেও চন্দ্র-দ্বিখণ্ডিতকরণ ঘটনার সত্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত-এর দশম পাঠে ব্যাস মুনী লিখেছেন যে, তাঁর যামানায় চাঁদ দু'টুকরো হয়ে পুনরায় মিলিত হয়েছিল। এবং তিনি এই চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনাকে, কোন প্রমাণ ছাড়াই, বিশ্বামিত্র-এর মোজেজা বলে উল্লেখ করে গেছেন।-----------মনে হয়, এই ঘটনার কথা হিন্দুদের মধ্যে, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা লিখিত হওয়ার সময়েও বহুলরূপে প্রচারিত ছিল। কেননা, এই ইতিহাস লেখক তার গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে হিন্দুদের মধ্যে প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী লিখেছেন যে, ধার্কা নগরীর রাজা-(ধার্কা ছিল মালব-এর ফম্বল নদীর তীরবর্তী একটি শহর, সম্ভবতঃ তারই নাম বর্তমানে ধারা নগরী)-তাঁর প্রাসাদের ছাদের উপরে বসা ছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন, চাঁদ সহসা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং পুনরায় মিলিত হলো। রাজা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন, এই ঘটনা আরবের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোজেজা। এবং তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।' – (সুরমা চ্‌শম আরিয়া, ৭৪-৭৯)।

(৫০)

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদাতায়ালার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গন্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা

হয়েছিল যে, তিনি-**খাতামুন্নবীঈন**। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবূয়্যতের সমস্ত পূর্ণতা উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর উপরে খতম হয়ে গেছে; এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সাঃ) পরে আর নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রসূল নেই; এবং তার (সাঃ) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বহির্ভূত। বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি খোদাতায়ালার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সাঃ) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিম বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সাঃ) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবূল করা হয়েছে যে, আজ অন্ততঃ পক্ষে বিভিন্ন শ্রেনীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দণ্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ, যাঁরা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সাঃ) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগন্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সাঃ) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই যে হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর উপরে খোদাতায়ালার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। **তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি**। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি ,তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বোঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবূয়্যত কি জিনিষ। এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সাঃ) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কী বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের উপরে প্রকাশিত হয়েছে।'

– (সংযুক্ত প্রবন্ধঃ চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)।

(৫১)

অন্য সকল নবীগণের দ্বারা যে সমস্ত মোজেজা প্রদর্শিত হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সেই মোজেজাগুলিরও পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। কিন্তু, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোজেজাগুলি এমন যে, সেগুলি প্রত্যেক যামানায়

প্রত্যেক সময়ে এই তাজা এবং জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামই জীবন্ত নবী এবং প্রকৃত জীবন সেটাই যা তাঁকে দান করা হয়েছে এবং অন্য আর কাউকেই দান করা হয়নি। এজন্য, তাঁর (সাঃ) শিক্ষাই জীবন্ত শিক্ষা, এবং সেই শিক্ষার সুফল ও কল্যাণ আজও তেমনি বিদ্যমান রয়েছে, যেমন তা ছিল তেরশ' বছর পূর্বে। অপর আর কোন শিক্ষাই এখন আর আমাদের সামনে বিদ্যমান নেই, যার উপরে আমলকারী বা অনুবর্তিতাকারী কোন ব্যাক্তি এই দাবী করতে পারে যে, তার সুফল ও কল্যাণ সে প্রাপ্ত হয়েছে। এবং সে এক আয়াতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র নিদর্শন হয়ে গেছে। কিন্তু, আমরা খোদাতায়ালার অনুগ্রহ আজও বিদ্যমান দেখতে পাচ্ছি। এবং সেই সমস্ত নিদর্শন ও কল্যাণ, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তা আজও পাচ্ছি। বস্তুতঃ খোদাতায়ালা এই ধারাপ্রবাহ বা সিলসিলাকে এজন্যই কায়েম করেছেন যে, এতে করে যেন ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে জিন্দা সাক্ষ্য পেশ করা যায়; এবং প্রমানিত করা যায় যে, এযুগেও সেই কল্যাণ ও সেই নিদর্শন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের পূর্ণ.আনুগত্যের ফলে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, যা তেরশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুতঃ এ যুগেও, অনুরূপ শত শত নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। এবং প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে আমরা আহ্বান করেছি যে, তারা যেন আমাদের মোকাবেলায় এসে তাদের সত্যতার নিদর্শন প্রদর্শন করে। কিন্তু, এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে, সে এসে তার ধর্মের সত্যতার স্বপক্ষে কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে।'

– (মালফুজাত, খ.৩, পৃ, ৩৭)।

(৫২)

'সকল গৌরবের অধিপতি সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালা যেভাবে সমগ্র জগতের বিপক্ষে, সকল বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে, সমস্ত দুশ্‌মনদের বিরুদ্ধে, সমস্ত অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে, সকল বিত্তবানদের বিপক্ষে, সকল পরাক্রমশালীদের বিপক্ষে, সমস্ত রাজা-বাদশাগণের বিপক্ষে, সমস্ত জ্ঞানী-গুণীদের বিপক্ষে, সকল দার্শনিকদের বিপক্ষে এবং সকল ধর্ম গুরুদের বিরুদ্ধে একজন নিরীহ, দুর্বল, দরিদ্র, অশিক্ষিত, ব্যক্তিকে পূর্ণ গৌরব ও প্রতাপসহ আপন ঐশী শক্তি প্রকাশের সাহায্যে সাফল্য দান করার অঙ্গীকার করেছিলেন, তার প্রতি কি কোন ঈমানদার ব্যক্তি বা কোন সত্যান্বেষী সন্দেহ পোষণ করতে পারে, যখন তা সময়মত পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণ হয়েও চলেছে? একি কোন মানুষের কাজ? দেখো! একজন নিরীহ, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, মিসকীন ব্যক্তি এমন এক সময়ে তার ধর্মকে প্রচার করার জন্য এবং ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঘোষনা দিয়েছিল যখন তার সঙ্গে কয়েকজন মাত্র নিঃস্ব দরবেশ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই ছিল না। এবং মুসলমানদের সংখ্যাও এমন ছিল যে, তাদেরকে একটা ছোট কামরার মধ্যেই একত্র করা যেতো, এবং হাতের আঙ্গুলে নাম ধরে ধরে গণনা করা যেতো, যাদেরকে সেই শহরের কিছু সংখ্যক লোক ইচ্ছা করলেই মেরে ফেলতে পারতো; তাদেরকেই মোকাবেলা করতে হয়েছে শাসকদের ও সম্রাটদের। এবং

তাদেরকে ঐ সমস্ত জাতির মোকাবেলা করতে হয়েছে, যারা সংখ্যায় কোটি কোটি ছিল এবং তাদেরেকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু, আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দৃষ্টি ফেরায়ে দেখো, খোদাতায়ালা কীভাবে ঐ সকল নিঃসম্বল ও দুর্বল লোকদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং কীভাবে তাদেরকে শক্তি এবং সম্পদ এবং রাজত্বসমূহ দান করেছেন, এবং কীভাবে সিংহাসনে আরোহনকারীদের মুকুট ও সিংহাসন তাদের কাছে সমর্পণ করেছেন। একদিন এমন ছিল, যেদিন তাদের জামায়াত এতো ছোট ছিল যে, একটি ঘরও ভর্তি হতো না; আর আজ তারা সংখ্যায় পৃথিবীতে কোটি কোটি হয়ে গেছে। **খোদাতায়ালা বলেছিলো, আমি আমার কোরআনকে নিজেই হেফাজত করবো।** এখন দেখো! এই কথা সত্য না মিথ্যা ? সেই যে শিক্ষা যা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সেই কালামের মাধ্যমে দান করেছিলেন, তা চিরকাল ধরে তাঁর সেই কালামের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। আর সেই কালামের অর্থাৎ কোরআন শরীফের লক্ষ লক্ষ হাফেজ রয়েছে এবং এই ধারা সেই কাল থেকেই চলে আসছে। খোদা বলেছিলেন যে, আমার কিতাবের জ্ঞান-হেকমতে, মারেফাতে, ভাষার উৎকর্ষতায়, রচনাশৈলীতে এবং ঐশীজ্ঞানের প্রকাশে, ধর্মীয় দলীল-প্রমান উপস্থাপনে কখনই কোন মানুষ মোকাবেলা করতে পারবে না। এবং কেউই তার মোকাবেলা করতেও পারেনি। আর কেউ যদি এটা অবিশ্বাস করে তাহলে সে পারলে এখনও মোকাবেলা করে দেখাতে পারে। **এবং পারলে সে আমাদের এই পুস্তকের সত্যতা ও সুক্ষতত্ত্বাবলী—–যা আমরা কোরআন শরীফ থেকে বর্ণনা করেছি–তার সমকক্ষ কোন পুস্তক রচনা করে পেশ করুক, এবং এজন্য আমরা দশ হাজার টাকার এক পুরস্কারও ঘোষণা করেছি।** আর যতক্ষণ সে তা করতে চেয়ে পেশ না করবে, ততক্ষণ সে অবশ্যই খোদাতায়ালার কাছে অপরাধী বলেই গণ্য থাকবে। খোদা বলেছিলেন যে, আমি সিরিয়াকে খৃষ্টানদের দখল থেকে বের করে এনে মুসলমানদেরকে সেই দেশের উত্তরাধিকারী বানাবে। বস্তুতঃ আজও পর্যন্ত মুসলমানরাই সেই দেশের ওয়ারিশ রয়েছে এবং এই সুসংবাদগুলি এমন ছিল যে, এগুলির সঙ্গে ঐশী শক্তি ও ক্ষমতা সম্পৃক্ত ছিল। এগুলি এমন ছিল না যে, জ্যোতিষীদের মত বলে দেওয়া যে, ভূমিকম্প হবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, এক দেশ আর এক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, মহামারী দেখা দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। খোদার কালামের অনুসরণে এবং তার প্রভাব ও কল্যাণের কার্যকারিতায় যারা কোরআন শরীফের আনুগত্য এখতিয়ার করে এবং খোদাতায়ালার রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর প্রতি শুদ্ধচিত্তে ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখে, এবং তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি এবং সকল নবী এবং সকল রসুল, সকল পবিত্রচিত্ত ব্যাক্তি, এবং সমস্ত কিছু যা ঘটে গেছে এবং আগামীতে ঘটতে থাকবে, তার সকল কিছুর উপরে উত্তম, পবিত্র, পূর্ণ, উৎকৃষ্ট ও উন্নত বলে জানে ও মানে, তারাও ঐ সকল নেয়ামত বা কল্যাণ থেকে অংশ পেয়ে থাকে। এবং যে শরবত মূসা ও মসীহ্‌কে (আঃ) পান করানো হয়েছিল, তারাও সেই শরবত প্রচুর পরিমানে, তৃপ্তির সঙ্গে, প্রাণভরে পান করেছে এবং এখনও পান করছে। ইসরাঈলী আলো দ্বারা তারা আলোকিত, বনী ইয়াকুব-এর পয়গম্বরদের আশিস ও কল্যাণ দ্বারা তারা ভূষিত। সোবহানাল্লাহ্! ছুম্মা সোবহাল্লাহ্!

(আল্লাহ্ কত পবিত্র! আবারও বলছি, আল্লাহ কতই না পবিত্র!) হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কতই না মহান মর্যাদার নবী! আল্লাহ্! আল্লাহ্! কত আজিমুশ্শান নূর--মহামহিমান্বিত আলো। যার নগন্য খাদেম, অধম থেকে অধম উম্মত, যার নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট চাকরও ঐসমস্ত উন্নত স্তরে পৌছে যাচ্ছে।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা নবীয়্যেনা ও হাবীবানা সাইয়্যেদুল আম্বিয়ায়ে
ওয়া আফজালুর রুসূলে ওয়া খায়রুল মুরসালীন ওয়া খাতামুন্নবীঈনা
মুহাম্মদেঁও ওয়া আলেহি ও আসহাবেহি ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম।

এই যামানার পাদ্রী এবং পণ্ডিত এবং ব্রাহ্ম এবং আর্য এবং অন্য সব বিরুদ্ধবাদীরা যেন চমকে না ওঠেন যে, কোথায় সেই সকল আশিস ও কল্যাণ? কোথায় সেই আসমানী নূর বা ঐশী আলোক, যার দ্বারা হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের রহমতপ্রাপ্ত উম্মত মসীহ্ এবং মূসার (আঃ) কল্যাণরাজি দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত এবং সেই আলোকরাশি দ্বারা আলোকিত যার থেকে অন্য সকল জাতি এবং সকল ধর্মের অনুসারীরা বঞ্চিত রয়েছে এবং হতভাগ্য হয়ে গেছে? এই কুধারণাকে দূর করার জন্য আমরা বারবার এই পাদটীকাতেই লিখে দিয়েছি যে, সত্যান্বেষীর জন্য, অর্থাৎ যে ইসলামের বিশেষ বিশেষ কল্যাণ ও আশিস দেখে তৎক্ষনাৎ মুসলমান হওয়ার সৎসাহস রাখে, তার কাছে প্রমাণ পেশ করার জন্য আমরা জিম্মা রয়েছি। দ্বিতীয় পাদটীকায় আমরা বিষয়টি পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত করেছি। বরং আমরা এই পাদটীকায় একথাও লিখে দিয়েছি যে, কীভাবে খোদাতায়ালা তাঁর ঐশী ক্ষমতাবলী এবং কৃপা ও কল্যাণসমূহ মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে থাকেন এবং কীভাবে তিনি সেই সব ঘটনাবলীর শুভ-সংবাদ তাদেরকে দিয়েছেন, যা কিনা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। অতএব, যদি কোন পাদ্রী অথবা পণ্ডিত অথবা কোন ব্রাহ্ম, যে তার নিজের আভ্যন্তরীণ অন্ধকারের কারণে এই সমস্ত বিষয়কে অস্বীকার করে; কিংবা কোন আর্য অথবা অন্য কোন ধর্মের কোন অনুসারী যে সত্য সত্যই সততার সঙ্গে সত্যের অনুসন্ধান করে, তার উচিত যাবতীয় গর্ব, ঔদ্ধত্য এবং ভণ্ডামি ছেড়ে, এবং দুনিয়ার পূজা বাদ দিয়ে, গোয়ার্তুমি ও অবজ্ঞা-অবহেলা পরিত্যাগ করে, শুধু সত্যের অন্বেষণ এবং সত্য পাওয়ার জন্যেই সোজা আমাদের কাছে চলে আসা। তার উচিত এক গরীব ও নিরীহ মানুষের মতে আসা এবং সবর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য অবলম্বন করা এবং সৎ মানুষের ন্যায় অনুগত ও আন্তরিক হওয়া, তাহলেই সে তার লক্ষ্যে পৌছতে পারবে, ইনশাআল্লাহ্। এর পরও যদি কেউ তার মুখ ফেরায়ে নেয়, তবে সে নিজেই তার বেঈমানীর সাক্ষী হবে। -

– (বারাহীনে আহ্মদীয়, পৃ, ২৫৬-২৬৫, পাদটীকা ১১)।

(৫৩)

কোরআন শরীফ অত্যন্ত জোরেশোরে এই দাবী পেশ করেছে যে, সে খোদা-তায়ালার কালাম এবং হযরত সৈয়্যদনা ও মওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া

সাল্লাম হচ্ছেন সেই সত্য নবী ও রসূল যাঁর উপরে সেই পবিত্র কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুতঃ সেই দাবী নিম্নোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

الٓمٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۝ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

'আলিফ লাম মীম। আল্লাহ্ (সেই সত্তা), যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি সত্যসহ তোমার উপরে এই কিতাব নাযিল করেছেন।' ৩ঃ২–৪।

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্ তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। তাঁর থেকেই প্রত্যেকের জীবন এবং স্থায়িত্ব। তিনিই সত্যসহ এবং যথার্থ প্রয়োজন অনুসারে তোমার উপরে কেতাব অবতীর্ন করেছেন এবং আবারও বলেছেন ঃ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ

'হে মানবজাতি! নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের নিকট সত্যসহ আগমন করেছে ' ৪ঃ১৭১।

অর্থাৎ হে লোক সকল! সত্য এবং প্রয়োজনের যাথার্থ্য সহ এই রসূল তোমাদের নিকটে আগমন করেছে। পুনরায় বলেছেন ঃ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ

'আমরা একে সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহ ইহা অবতীর্ণ হয়েছে।' ১৭ঃ১০৬। অর্থাৎ যথার্থ প্রয়োজনীয়তা বা জরুরতে হাক্কাসহ আমরা এই কালাম নাযিল করেছি, এবং যথার্থ প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইহা অবতীর্ণ হয়েছে। এবং পুনরায় বলেছেন ঃ

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكُمْ نُوْرًا مُّبِیْنًا

'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমান এসেছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক অবতীর্ণ করেছি।' ৪ঃ১৭৫।

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমাদের নিকটে এই নিশ্চিত প্রমান দেওয়া হয়েছে এবং এক প্রকাশ্য নূর তোমাদের প্রতি আমি নাযিল করেছি। আবারও বলেছেন ঃ

قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا 'তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রসূল।' ৭ঃ১৫৯।

অর্থাৎ লোকদেরকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্র পয়গম্বর হয়ে আগমন করেছি। আবারও বলেছেন ঃ

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ
كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝

'এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং যা মুহাম্মদের উপরে নাযিল করা হয়েছে তার উপরেও ঈমান আনে, বস্তুতঃ এ হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

পূর্ণ-সত্য, তিনি তাদের অনিষ্টতাসমূহকে দূর করে দেবেন এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করে দেবেন।' ৪৭ঃ৩।

অর্থাৎ যে সকল লোক ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এবং এই কিতাবের উপরে ঈমান আনে যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটাই সত্য, খোদা তাদের পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক–ঠাক করে দেবেন।

এমনি আরও শতশত আয়াত আছে যেগুলিতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এই দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীম খোদার কালাম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্য নবী। কিন্তু যে সব আয়াতের উল্লেখ আমরা করেছি সেগুলিই এ ব্যপারে যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে, আমি সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদীদের স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে, **কোরআন শরীফ যত জোরের সঙ্গে তার দাবী পেশ করেছে সেভাবে আর কোন কেতাবই নিজের দাবী পেশ করেনি**। আমরা অত্যন্ত আগ্রহী যে, আর্যরা তাদের বেদ থেকে অন্ততঃ এতটুকু প্রমান করে দিক যে, বেদ চারটি খোদার কালাম হওয়ার দাবী করে এবং পরিষ্কারভাবে বলে যে, সেগুলি অমুক অমুক ব্যক্তির উপরে অমুক অমুক যামানায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্‌র কিতাব হওয়ার প্রমাণের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, সেই কিতাব স্বয়ং দাবী করবে যে, তা আল্লাহ্‌র কিতাব। কেননা, যে কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার কোন দাবী বা ইংগিত নিজে করে না, তাকে খোদাতায়ালার প্রতি আরোপ করা অর্থাৎ তাকে খোদাতায়ালার কেতাব বলে চালিয়ে দেওয়াটা স্রেফ অনধিকার চর্চা।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য তা হচ্ছে, কোরআন শরীফ নিজের খোদা তায়ালার তরফ থেকে হওয়া সম্পর্কে এবং আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের রেসালাত সম্পর্কে শুধু দাবী করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং সেই দাবীকে অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেও দিয়েছে। ঐ সমস্ত দলীল-প্রমাণকে আমরা, ইনশাআল্লাহ্‌, ধারাবাহিকভাবে লিখে দেব। সেই সকল প্রমানাদি থেকে প্রথম একটি প্রমাণ আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে পেশ করতে চাই যাতে করে সত্যন্বেষীরা এই প্রমাণের আলোকে অন্যান্য কেতাবের সঙ্গে কোরআন করীমের তুলনা করতে পারে। এ ছাড়া আমরা প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকেও আহ্বান জানাই যে, যদি এই শ্রেনীর প্রমানাদি, যা কোন কেতাবের মধ্যে পাওয়াটা সেই কেতাবের সত্যতার প্রকাশ্য প্রমাণ, তাদের কেতাবসমূহ ও নবীগণের সম্পর্কেও পাওয়া যায়, তবে সেগুলো তাঁরা যেন অবশ্যই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। অন্যথায়, তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, এই শ্রেনীর উচ্চ স্তরের দলীল-প্রমাণ তাদের কেতাবগুলোতে নেই, এবং সেগুলো এথেকে বঞ্চিত। তবে, আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এবং আস্থার সঙ্গে বলছি যে, এই শ্রেণীর প্রমাণ তাদের ধর্মের মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। আর যদি, ভুল আমাদেরই হয়ে থাকে, তবে সেই ভুল প্রমানিত করা হোক।

প্রথম যে দলীল কোরআন শরীফ, তার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়া সম্পর্কে, পেশ করে তা হচ্ছে, সুস্থ-বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে কোন একটি সত্য কেতাবের এবং কোন এক সত্য ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমনকারী রসূলের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও বড় প্রমাণ এই যে, তাঁর আবির্ভাব এমন এক সময়ে হবে যখন যামানা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে; এবং মানুষ তৌহিদের জায়গায় শির্‌ক, পবিত্রতার জায়গায় পাপ ও অপবিত্রতা, ইনসাফের পরিবর্তে জুল্‌ম, এবং জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতাকে অবলম্বন করবে। এবং একজন 'সংস্কারক'-এর আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। এবং এমন সময়ে সেই রসূলের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া উচিত যখন তাঁর সংস্কার ও সংশোধনের কাজ সুসম্পন্ন হবে। এবং যতদিন তাঁর সংস্কার ও সংশোধনের কাজ সম্পূর্ণ হবে না, ততদিন পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ হেফাজত করা হবে। এবং তিনি এক ভৃত্যের ন্যায় হুকুম পেয়েই আসবেন এবং হুকুম হলেই চলে যাবেন। সংক্ষেপে, তিনি এমন এক সময়ে আগমন করবেন যখন যামানাই চীৎকার করে করে বলতে থাকবে যে, একজন ঐশী সংস্কারক এবং কেতাব-এর আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তাকে এমন সময়ে ফিরে যাওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হবে, যখন সংশোধনের চারা গাছ দৃঢ়রূপে লাগানো হয়ে যাবে এবং এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবে।

কাজেই, এই কথা আমরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করছি যে, এই প্রমাণ যেভাবে কোরআন শরীফ ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে যত বেশী উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়েছে, সেভাবে অন্য আর কোন নবী ও কেতাবের ক্ষেত্রে কখনোই হয়নি। আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই দাবী ছিল যে, তিনি সমস্ত জাতিসমূহের জন্য আগমন করেছেন। সুতরাং, কোরআন শরীফ সমস্ত জাতিসমূহকে ন্যায্যতঃ এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল যে, তারা নানাভাবে শির্‌ক, পাপ-পঙ্কিলতা ও অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যেমন বলা হয়েছে ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (জলে ও স্থলে ফ্যাসাদ ছেয়ে গেছে। ৩০ঃ৪২।)

অর্থাৎ সাগরও কলুষিত হয়েছে, ভূতলও কলুষিত হয়েছে। আবার বলা হয়েছে ঃ

لِيَكُونَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (যেন সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হয়। ২৫ঃ২।)

অর্থাৎ, আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি যাতে করে তুমি সকল জাতিগুলোকেই সতর্ক করতে পার। এবং তাদের এই কথা জানিয়ে দিতে পার যে, তারা তাদের পাপকাজ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের দরুন খোদাতায়ালার কাছে নিকৃষ্ট পাপীরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতের মধ্যে যে 'নযীর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা পৃথিবীর সকল জাতির জন্যই প্রযোজ্য। এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে, গোনাহ্‌গার ও অনাচারীদেরকে ভীতি-প্রদর্শন করা। এই শব্দটি থেকে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, কোরআনের এই দাবী ছিল যে, সারাটা পৃথিবী কলুষিত হয়ে গেছে, বিগড়ে গেছে, এবং

প্রত্যেকেই সত্যতা এবং সৎকর্মের পথ পরিত্যাগ করেছে। কেননা, ভীতি-প্রদর্শন তাদেরকেই করা হয় যারা অবাধ্য, ফাসেক, মুশরেক, পাপী ও অনাচারী। বস্তুতঃ পাপীদেরকেই সতর্ক করা হয়, ভয় প্রদর্শন করা হয়, নেক বা পূণ্যবানদেরকে করা হয় না। এ কথা তো প্রত্যেকেই জানে যে, অবাধ্য ও বেঈমানদেরকেই সব সময় ভীতি-প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এবং সুন্নাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র নিয়মও এটাই যে, যিনি নবী হবেন তিনি পুন্যবানদের জন্য হবেন 'বশীর'-সুসংবাদদাতা, এবং পাপীদের জন্য 'নযীর'- সতর্ককারী। তদুপরি, একজন নবীই যখন তামাম দুনিয়ার জন্য 'নবী' হয়ে এসেছেন, তখন মানতেই হবে যে, সেই সারাটা পৃথিবী অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এবং এ এমন একটি দাবী, যা না তৌরিত করেছে মুসা আলাইহেস সালাম সম্পর্কে, না ইঞ্জিল করেছে ঈসা আলাইহেস সালামের যামানা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে, কেবল কোরআন শরীফই এই দাবী করেছে। এবং এ কথাও বলেছে ঃ

كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

(তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে। ৩ঃ১০৪)

অর্থাৎ, তোমরা এই নবীর আগমনের পূর্বে দোজখের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলে। তাছাড়া, খৃষ্টানদেরকে এবং ইহুদীদেরকেও এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, তোমরা তোমাদের 'দাজাল' বা মিথ্যাচারিতা দ্বারা খোদাতায়ালার কেতাবগুলিকে বদলে ফেলেছ। এবং তোমরা সকল জাতিকেই দুষ্কৃতি এবং অপকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিচালিত করেছে। পৌত্তলিকদেরকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে যে, তোমরা পাথর পূজা করছো, মানুষ পূজা করছো, নক্ষত্র এবং নানান বস্তুর পূজা করছো, এবং আসল স্রষ্টা যিনি তাঁকে ভুলে গেছো। তাছাড়া, তোমরা এতীমের মাল খাচ্ছ, শিশুদেরকে হত্যা করছো এবং অংশীদারদের প্রতি জুলুম করছো, এবং সর্বক্ষেত্রেই সীমা লংঘন করে চলেছ। তাই, বলা হয়েছে ঃ اِعْلَمُوٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

(জেনে রাখ, আল্লাহ্ জমিনকে তার মৃত্যুর পরে জীবিত করেন। ৫৭ঃ১৮।)

অর্থাৎ, তোমাদের জানা উচিত যে, সারা পৃথিবীটাই মরে গিয়েছিল, এখন আবার তাকে নতুন করে জীবিত করছেন আল্লাহ্তায়ালা। সংক্ষেপে, কোরআন শরীফ সারা পৃথিবীকেই শিরক, অনাচার ও পৌত্তলিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, যা সমস্ত অপকর্মের জননী, এবং খৃষ্টান ও ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীর যাবতীয় দুষ্কৃতির মূল বলে দায়ী করেছে এবং তাদের প্রত্যেকটি অপকর্মের বিবরণ দিয়েছে। এবং সমসাময়িক যুগের এমন এক চিত্র অঙ্কন করেছে যে, দুনিয়া সৃষ্টি হওয়া অব্দি একমাত্র নূহ (আঃ)-এর যামানা ছাড়া, এর আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে আমরা যে কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করেছি, তা-ই প্রাথমিক প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা এ প্রসঙ্গের সমস্ত আয়াতের উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম। সুধী পাঠকদেরকে আমরা বলবো যে, তাঁরা যেন কোরআন শরীফ গভীরভাবে পাঠ করেন, যাতে করে বুঝতে পারেন যে, কতো জোরালোভাবে এবং কত কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভাষায়

কোরআন শরীফ বর্ণনা করেছে যে, সারা পৃথিবী কলুষিত হয়ে গেছে, সারাটা পৃথিবী মরে গেছে এবং মানুষেরা দোজখের কিনারায় পৌঁছে গেছে। এবং কীভাবে বার বার বলেছে যে, সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে দাও যে, সে দারুন বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে আছে। গভীরভাবে কোরআন অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, পৃথিবী শির্‌ক এবং পঙ্কিলতা এবং পৌত্তলিকতা এবং বিভিন্ন প্রকারের পাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং অপকর্মের গভীর কূপে ডুবে গেছে। এ কথা ঠিক যে, ইঞ্জিলের মধ্যেও ইহুদীদের অসৎ ক্রিয়াকাণ্ডের কিছু কিছু বিবরণ আছে। কিন্তু, মসীহ্ তো একথা কোথাও বলেন নি যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত লোক আছে, যাদের সবাইকে একত্রে 'জাতি সমূহ' বলে উল্লেখ করা যায়, তা বিগড়ে গেছে, বিকৃত হয়েছে, মরে গেছে। এবং দুনিয়া শিরক ও পাপে ভরে গেছে। এছাড়া তিনি তাঁর রেসালাতের সার্বজনীনতারও দাবী করেন নি। এটা তো জানা কথাই যে, ইহুদীরা ছিল ছোট্ট একটা জাত। এবং কেবল তারাই ছিল মসীহ্-এর সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল, তারাই ছিল মসীহের দৃষ্টির আওতায় এবং তারা মাত্র কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা ছিল। পক্ষান্তরে, কোরআন করীম সারাটা পৃথিবীর মরে যাওয়া উল্লেখ করেছে। এবং প্রত্যেকটি জাতির খারাপ অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা বলেছে এবং বলেছে যে, প্রত্যেক প্রকারের পাপে পৃথিবী মরে গেছে। ইহুদীরা তো বলতো যে, তারা নবীদের সন্তান-সন্ততি এবং তারা তৌরাত মেনে চলে, যদিও তারা আমল বা ক্রিয়া-কলাপের দিক থেকে খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনের যামানায় মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা ছাড়াও বিশ্বাসের দিক থেকে ফতুর বা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল, হাজারো মানুষ নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল। হাজারো মানুষ ওহী-ইলহাম বা ঐশীবাণীতে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। এবং প্রত্যেক প্রকারের অপকর্ম পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। পৃথিবীতে তখন বিশ্বাসে এবং কর্মে খারাপীর এক তুফান বইতেছিল। এছাড়া, মসীহ্ তো তাঁর ছোট্ট একটা জাতি, ইহুদীদের অসৎ কার্য-কলাপের কিছু কিছু কথা বলেছেন, এথেকে এটা অবশ্য ধারনা করা যায় যে, সে সময় খাস করে ইহুদীদের সেই ছোট জাতিটার জন্য একজন সংস্কারকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, যে প্রমানকে আমরা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হওয়ার পক্ষে পেশ করছি, অর্থাৎ, সার্বজনীন ফাসাদের যামানায় আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমন এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কার ও সংশোধনের পরে তাঁর প্রত্যাগমন, এবং তাঁর দ্বারা উভয় ক্ষেত্রেই কোরআন শরীফকে উপস্থাপন এবং সেদিকে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ, তা এমন এক বিষয় যে, তা ইঞ্জিল কেন, কোরআন শরীফ ছাড়া পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থেই পাওয়া যাবেনা। কোরআন শরীফ স্বয়ং সেই সমস্ত দলীল প্রমাণ পেশ করেছে এবং স্বয়ং বলে দিয়েছে যে, এই উভয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলেই তার সত্যতা প্রমানিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এক তো হচ্ছে সেটাই যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, তিনি (সাঃ) এমন এক যামানায় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সার্বজনীনভাবেই বিভিন্ন শ্রেনীর পাপকাজ এবং কুবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং দুনিয়া সত্য, সত্যতা এবং তৌহিদ ও পবিত্রতা থেকে বহু বহু দূরে সরে গিয়েছিল। এবং কোরআন শরীফের এই কথার তসদীক বা সত্যায়ন তখনই হয়ে যায় যখন সেই সময়ের প্রত্যেকটি জাতির ইতিহাস পাঠ করা হয় তুলনামূলকভাবে। কেননা, প্রতিটি জাতির

স্বীকারোক্তি থেকে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, সেই যামানা এমন ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল যে, প্রত্যেকটি জাতি সৃষ্টির পূজার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। এবং কোরআন যখন প্রত্যেকটি জাতিকেই ভ্রান্ত বা গোমরাহ এবং দুষ্কৃতকারী বলে আখ্যায়িত করলো, তখন এমন একটি জাতিকেও পাওয়া গেল না, যা সেই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত বলে প্রমানিত করতে পারলো। দেখো! আল্লাহ্‌তায়ালা কত জোরের সঙ্গে আহলে-কিতাবদের অপকর্মসমূহের এবং সারাটা পৃথিবীর মরে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۸﴾

'এবং তারা (মোমেনরা) যেন ওদের মত না হয় যাদেরকে ইতিপূর্বে কেতাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাদের উপরে যামানা দীর্ঘ হওয়ার ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতকারী ছিল ।। জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। অবশ্যই, আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি , যাতে তোমরা বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করতে পার।'
– ৫৭ঃ১৭, ১৮।

অর্থাৎ, মোমেনদের উচিত, তারা যেন আহলে কেতাবদের চাল-চলন আচরণ পরিহার করে চলে। তাদেরকে ইতিপূর্বেই কেতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপরে এক দীর্ঘ যামানা অতিবাহিত হয়ে গেছে। ফলে, তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও দুষ্কৃতকারী হয়ে গেছে। এ কথাও জেনে রাখ যে, যমীন মরে গিয়েছিল, এবং খোদাতায়ালা পুনরায় নতুন করে যমীনকে জীবন্ত করে তুলছেন। এই তো কোরআনের প্রয়োজনীয়তা ও সত্যতার নিদর্শন, এবং তা এজন্যই বর্ণনা করা হলো যে, তোমরা যেন নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর।

এখন চিন্তা করে দেখো, এই যে দলীল যা তোমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে, তা আমাদের কোন মনগড়া কথা নয়। বরং, কোরআন নিজেই পেশ করছে। এবং দলীলের উভয় অংশ বর্ণনা করার পর আবার নিজেই বলছে ঃ

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۸﴾ (আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি যাতে তোমরা বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ কর। ৫৭ঃ১৮।)

অর্থাৎ এই রসূলের এবং এই কেতাবের আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হওয়ার এটাও এক নিদর্শন যা আমরা বর্ণনা করে দিয়েছি যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো, বুঝো এবং সত্যে উপনীত হতে পার।

এই দলীলের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তখনই দুনিয়া থেকে তাঁর প্রভুর দিকে ডেকে নেওয়া হয়েছে, যখন তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করেছেন। এবং এই বিষয়টিও কোরআন শরীফ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমানিত। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্মকে) পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (কৃপা-কল্যাণকে) সম্পূর্ণ করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম। ৫ঃ৪।'

অর্থাৎ, আজ আমি কোরআনের নাযিলের মাধ্যমে এবং জনগণের হৃদয়ের সংশোধনের মাধ্যমে তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপরে পূর্ণ করে দিলাম, এবং তোমাদের জন্য দ্বীনে ইসলামকে মনোনীত করলাম। এই কথার তাৎপর্য এটাই যে, কোরআন মজীদ যতটা নাযিল হওয়ার ছিল হয়ে গেছে, এবং আগ্রহী হৃদয়গুলিতে বিস্ময়কর ও আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত করেছে এবং তাদের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। এবং আপন নিয়ামতকে তাদের উপরে পূর্ণ করে দিয়েছে। এবং এই হচ্ছে সেই দুটি জরুরী মৌলিক বিষয় যা একজন নবীর আগমনের প্রধান কারণ। এখন দেখো! এই আয়াত কত জোরেশোরে বলছে যে, আঁহুহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহন করেননি যতদিন না দ্বীনে ইসলামের ও কোরআনের অবতরণ বা নুযুল সম্পূর্ণ হয়েছে এবং হৃদয়সমূহের পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছ। এবং এ হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন আল্লাহ্র তরফ থেকে হওয়ার, যা কখনোই কোন মিথ্যা বাদীর ভাগ্যে জুটে না। আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বের কোন নবীই এতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সফলতার দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেন নি। একদিকে আল্লাহ্র কেতাবও শান্তি ও সুরক্ষার সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং অপরদিকে জনগণের সংশোধন ও প্রশিক্ষণও সম্পূর্ণ হয়েছে এবং অবিশ্বাসী জনগণ সব দিক থেকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছে এবং ইসলাম সব দিক দিয়েই বিজয়ী হয়েছে।

পুনরায় অন্যত্র বলা হয়েছে, اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

(যখন আল্লাহ্র সাহায্য এবং বিজয় আসবে এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবে; সুতরাং তুমি তোমার প্রভু- প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহনকারী। ১১০ঃ২-৪।)

অর্থ্যাৎ যখন সেই সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে, যা আসার কথা ছিল এবং যার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল; এবং তুমি দেখেছ যে, জনগণ দলে দলে ইসলাম ধর্মে

প্রবেশ করছে; অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা কর। অর্থাৎ বলে দাও যে, এসব যা কিছু ঘটেছে তা আমার দ্বারা ঘটেনি, বরং তা সবই ঘটেছে, তাঁরই (আল্লাহ্‌র) কৃপায়, দয়ায় এবং সাহায্যে। এবং আল্-বিদায়ী ইস্তেগ্ফার কর (তওবা কর), কেননা তিনি রহমতের সঙ্গে বার বার তওবা কবুলকারী, প্রত্যাবর্তন কারী।

নবীদেরকে যে এস্তেগ্ফার করতে বলা হয়েছে, তাকে সাধারণ মানুষের গোনাহ্ মাফের জন্য তওবা করার ন্যায় মনে করাটা এক ধরনের আহাম্মকী। তাঁদের ক্ষেত্রে ইস্তেগ্ফার হচ্ছে, তাঁদের নাস্তি (কিছু না হওয়া), তাদের বিনয় ও দুর্বলতার স্বীকৃতি এবং সাহায্য প্রার্থনার শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ পন্থা। এই সূরাতে (আন্-নসর) বলা হয়েছে যে, যে কাজের জন্য আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহন করেছে। এবং এর মধ্যে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতেরও ইঙ্গিত ছিল। বস্তুতঃ এর পরে, বৎসর খানেকের মধ্যেই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়। অতএব, এই আয়াতগুলি নাযিল হওয়াতে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেমন স্বাভাবিকভাবেই খুশী হয়েছিলেন তেমনি উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, বাগান তো লাগানো হয়েছে, কিন্তু এতে পানি দেওয়া, দেখা-শোনার কি হবে? তাই, খোদাতায়ালা তার এই চিন্তাকে দূরীভূত করার জন্য ইস্তেগ্ফার করার হুকুম দিয়েছিলেন। কেননা, আভিধানিক অর্থে মাগফেরাত বলতে সেই আবৃতকরণকে বুঝায়, যার ফলে মানুষ আপদ-বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে। এদিক থেকে 'মেগ্ফার' অর্থ হচ্ছে হেল্‌মেট। এবং মাগফেরাত -এর তাৎপর্য হচ্ছে, যে বিপদের জন্য ভয় আছে অথবা যে পাপের আশংকা আছে, খোদা তায়ালা যেন সেই বিপদ বা সেই পাপ সংঘটিত হতে না দেন এবং আবৃত করে রাখেন। সুতরাং, এই ইস্তেগ্ফার-এর প্রেক্ষিতে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, এই ধর্মের জন্য চিন্তা করো না, খোদা-তায়ালা একে নষ্ট হতে দিবেন না। এর প্রতি সর্বদা রহমতের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতে থাকবেন। এবং ঐ সমস্ত বিপদাবলীকেই প্রতিহত করবেন, যেগুলো কোন দুর্বলতার সময়ে আপতিত হতে পারে।' –(নূরুল কোরআন, নং১, পৃ,৪-২৭)।

(৫৪)

'পুনরায় একবার আমরা আমাদের প্রথম বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলতে চাই যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবূয়্যত এবং কোরআন করীমের সত্যতার এই দলীল থেকে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে এবং উজ্জ্বলরূপে প্রমানিত হয় যে, আঁজনাব আলাইহেস সালাতো ওয়াস্ সালামকে এমন সময়ে পৃথিবীতে প্রেরণ কর হয়েছিল যে, যখন পৃথিবীর সমসাময়িক অবস্থার প্রার্থনা এটাই ছিল যে, একজন মহান মর্যাদার সংশোধনকারী -আজিমুশ্‌শান মুসলেহ-প্রেরণ করা হউক। এবং তিনি যেন ততদিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ না করেন অথবা নিহত না হন, যতদিন না সাধুতাকে তিনি ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবূয়্যত সহ আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর প্রয়োজনীয়তা দুনিয়ার কাছে প্রমানিত করেছেন। এবং প্রত্যেকটি জাতিকেই তার

শিরক, অসাধুতা এবং অনাচার ও অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত করেছেন। এবং এসব ব্যাপারেই প্রচুর বিবরণ রয়েছে কোরআন করীমে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আয়াতের উপরে চিন্তা করে দেখো, যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

'সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী যিনি আপন বান্দার উপরে আল্-ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে করে সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। ২৫ঃ২।'

অর্থাৎ, তিনি অফুরন্ত আশিস ও কল্যাণের অধিকারী যিনি তাঁর বান্দার উপরে কোরআন নাযিল করেছেন যেন সে সারা জগতের প্রতি সতর্ককারী হতে পারে অর্থাৎ তাদের বিপথগামিতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে সতর্ক করে দিতে পারে। অতএব, এই আয়াত এই বিষয়ের পক্ষে একটি দলীল যে, কোরআনেরও দাবী এটাই যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন এক সময়ে আগমন করেছিলেন যখন সমস্ত পৃথিবী এবং সমস্ত জাতিগুলি বিকৃত ও কলুষিত হয়ে পড়েছিল। এবং এই দাবীকে বিরুদ্ধ জাতিগুলো কেবল মৌনতা অবলম্বন করেই মেনে নেয়নি, বরং নিজেদের স্বীকারোক্তি দ্বারাও মেনে নিয়েছিল। অতএব, এথেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত এটাই দাঁড়ায় যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাস্তবিক পক্ষেই এমন এক সময়ে আগমন করেছিলেন যখন একজন সত্য ও কামেল নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

আমরা যদি আবারও আমাদের বক্তব্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃকপাত করি এবং দেখতে চাই যে, কোন সময়ে আঁহযরত সাল্লালাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে (আল্লাহ্‌র কাছে) ফিরে যেতে বলা হয়েছিল। তাহলে, আমরা দেখতে পাব যে, কোরআন শরীফ আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে এবং বিশদভাবে এই খবর দিয়েছে যে, এমন এক সময়ে ফিরে যাওয়ার হুকুম হয়েছিল যখন তিনি তাঁর (সাঃ) কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। অর্থাৎ, সেই সময়ের পর ডেকে পাঠানো হয়েছিল যখন এই আয়াতও নাযেল হয়েছিল যে, মুসলমানদের জন্য শিক্ষাদানের কাজ সফলভাবে শেষ হয়েছিল এবং ধর্মের জন্য যা কিছু অবতীর্ন হওয়ার ছিল তা সবই অবতীর্ণ করা হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া, এ খবরও দেওয়া হয়েছিল যে, খোদাতায়ালার সাহায্য সহায়তাও সম্পূর্ণরূপে দান করা হয়েছিল। এবং জনগণ দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়েছিল। এবং সেই সব আয়াতও নাযেল হয়েছিল যে, খোদাতায়ালা তাদের হৃদয়ে ঈমান ও তাকওয়া উৎকীর্ণ করে দিয়েছেন, এবং তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতার প্রতি বিরূপ করে দিয়েছেন, এবং তাদেরকে পবিত্র ও সৎ গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন। ফলে, তাদের চরিত্র, আচার-আচরণ এবং হৃদয়ে এক অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ সবকিছু ঘটে যাওয়ার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা আন্-নসর যার বক্তব্য হলো, নবূয়্যতের সমস্ত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছে এবং ইসলাম মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে। এর পরেই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলইহে ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, এই সূরাতে আমার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত

রয়েছে। অতঃপর, তিনি (সাঃ) হজ্জ করেন এবং এই হজ্জেরই নাম হোজ্জাতুল বিদা। এই হজ্জের সময়ে তিনি হাজার হাজার লোকের মাঝখানে একটি উটনীর পিঠে বসে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বলেন, হে খোদার বান্দারা, শোন! আমার প্রভুর তরফ থেকে আমার প্রতি এই হুকুম ছিল যে, আমি যেন তাঁর সমস্ত হুকুম-আহকাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিই। তোমরা কি আজ এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, এ সমস্ত কিছুই আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ? তখন সমস্ত লোক, বরং সমস্ত জাতিই, বুলন্দ আওয়াজে এই জবাব দিল যে, হ্যাঁ সমস্ত কথা, সকল পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। তখন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তিন বার আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি এসব কিছুর সাক্ষী থেকো! আবার বললেন, আমি বিস্তারিতভাবে এসব কথা এজন্যই বললাম যে, হতে পারে, আমি আগামী বছর আর তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারবো না। পুনরায় তোমরা আর আমাকে এই স্থানে পাবে না। অতঃপর, মদীনায় ফিরে গেলেন, এবং পরের বছর ইন্তেকাল করলেন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহে ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম।

বস্তুতঃ, এ সমস্ত ইশারা-ইঙ্গিতই কোরআন শরীফে দেওয়া হয়েছিল, এবং এ সমস্ত কিছুরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ইসলামের ইতিহাস।

আজ পৃথিবীর বুকে কি এমন কোন খৃষ্টান অথবা ইহুদী অথবা আর্যকে পাওয়া যাবে যিনি তাদের নিজেদের এমন কোন সংস্কারককে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করতে পারেন, যাঁর আগমন হয়েছিল সবার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে, এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সেই প্রয়োজন মিটাবার পরে? এবং তাঁর বিরোধীরা যাদের প্রতি তাঁকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারাও কি স্বীকার করেছিল তাদের অপবিত্র ও অসৎ কার্য-কলাপের কথা? আমি জানি যে, এই প্রমাণ ইসলাম ছাড়া কারো কাছেই নেই। সবাই জানি যে, হযরত মূসা(আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল ফিরাউনের ধ্বংসের জন্য, এবং তাঁর স্বজাতিকে জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য, এবং তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবার জন্যে। সারা জগতের ফাসাদ ও অনাচার দূরীকরণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা ঠিক যে, তিনি ফেরাউনের কবল থেকে তাঁর জাতিকে মুক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু তাদেরকে তো তিনি শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। এবং প্রতিশ্রুত দেশে তাদেরকে পৌঁছাতেও পারেননি। এবং তাঁর হাতে আত্মিক সংশোধনের সৌভাগ্য বনী-ইসরাঈলের হয়নি। তারা বারবার নাফরমানি করতেছিল। এমনকি, এই পরিস্থিতিতেই হযরত মূসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করলেন। তাদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হলো না। হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর হাওয়ারীদের অবস্থাও জানা যায় খোদ ইঞ্জিল থেকেই, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। ইহুদীরা, যাদের কাছে মসীহ্ এসেছিলেন নবীরূপে, তারাও যে কী পরিমান হেদায়াত লাভ করেছিল মসীহ্ (আঃ)-এর জীবদ্দশায়, তাও সকলেরই জানা কথা। বরং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর নবূয়্যতকে যদি এই মানদণ্ডে বিচার করা হয়, তাহলে অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে বলতে হবে যে, এই মানদণ্ডে তাঁর নবূয়্যত কোনভাবেই প্রমানিত হবে না। – (নূরুল কোরআন,নং ১, পৃ, ২৯-৪০)।

'আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই যামানাতে যখন সারা পৃথিবীতেই শিরক বা অংশীবাদিতা এবং বিপথগামিতা, গোমরাহী এবং সৃষ্টির পূজা বিস্তার লাভ করেছিল, এবং সমস্ত লোক সত্য ধর্মমত পরিত্যাগ করেছিল। সিরাতুল মুস্তাকীম-কে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তার নিজস্ব বেদাত-এর পথ অনুসরন করছিল। আরবের সর্বত্র মূর্তি-পূজা দারুনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। পারশ্যে অগ্নি-পূজা ছেয়ে গিয়েছিল। হিন্দুস্থানে মূর্তি-পূজা ছাড়াও শত শত প্রকারের সৃষ্টি-পূজা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে কিছু সংখ্যক পুরাণ ও পুস্তক রচিত হয়েছিল, যেগুলির মাধ্যমে খোদার বহু বান্দাকে খোদা বানানো হয়েছিল, এবং অবতার-পূজার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পাদ্রী বোর্ট সাহেব এবং আরও কতিপয় ইংরেজ লেখকের কথা মতে, খৃষ্টান ধর্ম সে সময়ে এত বেশী কলুষিত হয়েছিল যে, অপর আর কোন ধর্মই তেমন কলূষিত হয়নি। এবং পাদ্রী ও যাজকদের অসৎ চরিত্র ও ভ্রান্ত ধর্মমতের কারণে তখন খৃষ্টান ধর্ম নিতান্ত অমর্যাদাকর অবস্থায় পতিত হয়েছিল। এবং খৃষ্টান ধর্মমতে মাত্র দু'এক জন নয়, বহু লোককে খোদার আসনে বসানো হয়েছিল। অতএব, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন এক সার্বজনীন গোমরাহী বা বিপথগামিতার যামানায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন খোদ সমসাময়িক অবস্থার চাহিদা এটাই ছিল যে, একজন উন্নত মর্যাদার (আধ্যাত্মিক) চিকিৎসক ও সংস্কারকের -আবির্ভাব ঘটুক। কেননা, তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল ঐশী হেদায়াতের। সেই সময়েই আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে তৌহিদ ও সৎকর্মের আলোতে আলোকিত করা এবং শির্ক ও সৃষ্টি-পূজা, যা কিনা যাবতীয় অপকর্মের জননী, তার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করা, এই সত্য প্রমানিত করার পক্ষে এক সাফ দলীল যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদাতায়ালার সত্য রসূল ছিলেন এবং সমস্ত রসূলের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর (সাঃ) সত্য হওয়া তো একথা দ্বারাই প্রমানিত যে, ঐ সর্বব্যাপী অন্ধকার যুগে প্রাকৃতিক নিয়ম বা কানুনে কুদরত একজন সত্য হাদী বা পথ-প্রদর্শনকারীর মুখাপেক্ষী ছিল। এবং সুন্নতে ইলাহিয়া বা আল্লাহ্‌র নিয়মও চাচ্ছিল যে, একজন সত্য পথ-প্রদর্শকের আগমন হোক। কেননা, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন-এর কানুনে কুদরত এটাই যে, যখন পৃথিবীর বুকে কোন দুর্ভোগের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়, তখন তা দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যেমন, ক্রমাগত খরার দরুনণ যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মানুষ উজাড় হতে থাকে, তখন খোদাওন্দ করীম বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন, যখন কোন মহামারীতে লাখো মানুষ মারা যেতে থাকে, তখন যে কোন কারণে বাতাস বিশুদ্ধ হয়ে যায়, কিংবা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। যখন কোন জাতি জুলুমের কবলে পড়ে, তখন কোন ন্যায়-পরায়ণ দয়াশীল শাসকের অভ্যুত্থান ঘটে। তেমনিভাবে, মানুষ যখন খোদার রাস্তা ভুলে যায়,এবং তাঁর তৌহিদ ও তাঁর এবাদত পরিত্যাগ করে, তখন খোদাওন্দ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে তাঁর কোন বান্দাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, এবং নিজের কালাম বা ওহী-ইলহাম দ্বারা সম্মানিত করে বনী আদমের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন, যাতে তিনি সব

গোমরাহীর সংশোধন করেন, কলুষতা দূরীভূত করেন। এর মধ্যে নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, পরওয়ারদিগার, যিনি জগতের লালন ও পালনকর্তা, স্থিতি-দাতা, যিনি জগতের অস্তিত্বের রক্ষা-কর্তা, তিনি তাঁর মঙ্গলপ্রদায়ী কোন গুণকেই সৃষ্টির উপর থেকে প্রত্যাহার করে নেন না, এবং তাঁর কোন গুণ কখনই অকেজো বা শেষ হয়ে যায় না বরং, তাঁর প্রতিটি গুণই যথাসময়ে যথারীতি প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতএব, সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেচনায় এটা যখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে, প্রত্যকটি বিপদ-বিপর্যয়কে অপসারিত করার জন্য খোদাতায়ালার যথোপযুক্ত গুণ প্রকাশিত হয়ে থাকে, (তখন এটাই অবধারিত ছিল যে,) এবং ইতিহাস দ্বারাও এই সত্য প্রমানিত যে, এবং বিরুদ্ধবাদীদের স্বীকারোক্তি থেকেও সাব্যস্ত যে, এবং কোরআন মজীদের বিশদ বর্ণনা দ্বারাও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সময় এই আফত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলো সোজা-পথ পরিত্যাগ করেছিল, তৌহিদ ভুলে গিয়েছিল, সততা ও আন্তরিকতা বিসর্জ্জন দিয়েছিল এবং খোদাতায়ালার এবাদত ছেড়ে দিয়েছিল। এছাড়া, একথাও সকলের জানা আছে যে, এই সার্বজনীন ফাসাদের সংশোধন করে এবং জগতকে শিরকের অন্ধকার ও সৃষ্টি-পূজা থেকে বের করে এনে তৌহিদের উপরে কায়েম করেছেন যিনি,তিনিই হলেন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অন্য আর কেউই নন। এই সমস্ত ঘটনাবলী ও বিষয়াদি থেকে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত এটাই দাঁড়ায় যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে সত্য হাদী বা হেদায়াত দানকরী ছিলেন। বস্তুতঃএই সব দলীল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর পাক কালামে এরশাদ করেছেন ঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ۝

'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমার পূর্বে অবশ্যই সকল জাতির নিকটে (রসূল) পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর শয়তান তাদের কর্মসমূহকে তাদের নিকট মনোহর করে দেখিয়েছিল। সুতরাং, সে-ই আজ তাদের অভিভাবক হয়েছে, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।।

এবং আমরা তোমার উপরে এই কেতাব এই জন্য নাযেল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) তাদের নিকট উহা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিতে পার, যার সম্বন্ধে তারা পরস্পর মতভেদ করেছে এবং (আমরা ইহা নাযেল করেছি) হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ ঐ জাতির জন্য যারা ঈমান আনে।।

এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তিনি এর দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। যে সকল লোক (হক কথা) শ্রবন করে তাদের জন্য অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে। ১৬ঃ৬৪-৬৬।'

এখানে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, আমরা যে বিষয় তিনটির কথা আলোচনা করেছি, যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, আঁহযরত(সাঃ) সত্য হাদী বা সৎ পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন, তা কত সুন্দরভাবে ও পরিষ্কারভাবে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম, গোমরাহ বা বিপথগামীদের হৃদয়-যা শত শত বৎসর যাবৎ গোমরাহীতে পড়ে ছিল-তাকে শুষ্ক ও মৃত যমীনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; এবং আল্লাহ্‌র কালামকে মেঘের পানি-যা আসমান থেকে বর্ষিত হয়-তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে সেই কানুনে কদীম বা চিরন্তন নিয়মের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, খরা জনিত দুর্যোগের সময় আল্লাহ্‌র রহমত হামেশাই বনী আদমকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। এর মধ্য দিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, এই কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়ম শুধু জাগতিক পানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধ্যাত্মিক বা রূহানী পানিও রূহানী দুঃখ-দুর্দশার সময়ে অর্থাৎ সার্বজনীন গোমরাহির সময়ে অবশ্যই বর্ষিত হয়ে থাকে। এই অবস্থাতে হৃদয়ে আফত বা জ্বরা-ব্যাধির বিস্তারকে প্রতিরোধ ও নিরাময় করার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত অবশ্যই অবতীর্ণ হয়। আবার ঐ আয়াতসমূহে এই দ্বিতীয় বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে সারা পৃথিবী গোমরাহিতে নিপতিত হয়েছিল। পরিশেষে, এ বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে যে, **ঐ সমস্ত রূহানী মোর্দাদেরকে এই পবিত্র কালামই অর্থাৎ কোরআন শরীফই জিন্দা করেছে**। এবং কথাটা সবশেষে বলে দেওয়ার মধ্যেও এই কেতাবের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে। এবং সত্যান্বেষীদের দৃষ্টি এই দিকেই আকর্ষন করছে যে, ফুরকানে মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কেতাব।

যেভাবে এই দলীল দ্বারা হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্য নবী হওয়া প্রমানিত হয়, তেমনি এর দ্বারা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সকল নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়াও প্রমানিত হয়। কেননা, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সারাটা পৃথিবীর মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এবং **এই যে কাজ যা তাঁর (সাঃ) উপরে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তা প্রকৃত প্রস্তাবে, হাজার হাজার নবীর কাজ ছিল**।

-(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ ১১২-১১৬, পাদটীকা,১০)।

(৫৬)

'যে যামানায় আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছিল, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা এমন এক যামানা ছিল যার সমসাময়িক অবস্থা একজন অতি সম্মানিত ও মহান মর্যাদাবান ঐশী সংস্কারক এবং আসমানী পথ-প্রদর্শকের একান্ত মুখাপেক্ষী ছিল। যে সমস্ত শিক্ষা তিনি দান করেছিলেন তা সবই ছিল সত্য এবং তার

প্রয়োজনীয়তাও ছিল অপরিহার্য। এবং তার মধ্যে সেই সব কিছুই সন্নিবেশিত ছিল যা সেই যুগের সব চাহিদা মেটানোর জন্য অত্যাবশ্যক ছিল, যথেষ্ট ছিল। এবং সেই শিক্ষার প্রভাব ও কার্যকারিতা এরূপ ছিল যে, তা লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্য এবং সাধুতার প্রতি প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। লক্ষ লক্ষ বক্ষঃস্থলে **'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'** এর নক্সা অঙ্কিত করে দিয়েছিল। এবং যা নবুয়্যতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্থাৎ নাজাত বা পরিত্রাণের মূলনীতি সমূহের শিক্ষাদান, তা এমন পূর্ণ ও পারফেক্ট রূপে সুসম্পন্ন করেছিলেন, যা কোন নবীর দ্বারা কোন যামানাতেই সম্পন্ন হয়নি। এই সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে নির্দ্বিধায় হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এই সাক্ষ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত হয় যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম অবশ্যই খোদাতালার পক্ষ থেকে একজন সত্য হাদী বা সৎপথ প্রদর্শনকারী। যে ব্যক্তি গোঁড়ামি ও ঔদ্ধত্যের কারণে অস্বীকার করে তার রোগের তো কোন ঔষধ নেই। সে তো খোদাকেও অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সত্য এবং সাধুতা এমন সম্পূর্ণরূপে এবং সর্বোৎকৃষ্টরূপে একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তেমন আর কোন একজন নবীর মধ্যেও কেউ যদি দেখাতে পারতেন, তাহলে আমরাও না হয় এবার দেখে নিতাম।'

– (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ১১২–১১৪)।

(৫৭)

'আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন 'সত্য-এর ঘোষণার জন্য এবং প্রচারের জন্য **সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক–মুজাদ্দিদে আজম**। তিনি হারিয়ে যাওয়া সত্যকে উদ্ধার করে পুনরায় সারা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা তাঁর জন্য এক গর্বের বিষয়। দুনিয়ার কোনও নবীই এক্ষেত্রে তাঁর সম অংশীদার নন। তাঁর আগমনের সময়ে পৃথিবী ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এবং তাঁর আগমনে সেই অন্ধকার আলোতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যে জাতির মধ্যে তাঁর আগমন ঘটেছিল, সেই জাতি যতক্ষণ পুর্যন্ত না শির্‌কের জামা পরিত্যাগ করে তৌহিদের পোষাকে সুসজ্জিত হয়েছে ততক্ষণ তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। শুধু তাই নয়, সেই জাতির লোকদেরকে তিনি ঈমানের অতি উন্নত স্তরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁরা সাধুতা, কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ও দৃঢ়–বিশ্বাসের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছিলেন তাঁদের কাজেকর্মে, দুনিয়ার বুকে এক কথায়, তা তুলনাবিহীন। এই সাফল্য, এই মহান সাফল্য আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য আর কোন নবীর ভাগ্যেই জোটেনি। এটাই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবূয়্যতের এক বড় প্রমাণ। তিনি এমন এক যামানায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আগমন করেছিলেন যখন যামানা অতি গভীর অন্ধকারে নিপতিত হয়েছিল এবং স্বভাবতঃই একজন অতি মহান সংস্কারকের প্রতীক্ষায় ছিল। এবং এমন এক সময়ে তিনি (সাঃ) দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে গেছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শির্‌ক ও মূর্তি-পূজা বর্জন করে তৌহিদ ও সাধুতার পথ গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই অসামান্য ও পূর্ণ সংস্কারকের কাজ কেবল তাঁরই জন্য এককরূপে নির্ধারিত ছিল। তাই, তিনি একটি জাতিকে যারা পশুর স্তরে নেমে গিয়েছিল, তাদেরকে

মানুষের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। অন্য কথায়, বলা যায়, তিনি পশুকে মানবে রূপান্তরিত করেছিলেন। এবং সেই মানবকে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ করে তুলেছিলেন। এবং সেই সভ্য ও শিক্ষিত মানুষকে খোদা-প্রাপ্ত মানুষে উন্নীত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বা রূহানিয়াতের প্রকৃতি ফুৎকার করে দিয়েছিলেন। এবং সত্য খোদার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে তখন খোদাতায়ালার রাস্তায় ভেড়াছাগলের ন্যায় জবেহ্ করা হয়েছে, পিপীলিকার ন্যায় পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে তবু তারা ঈমান ছাড়েনি। বরং, প্রত্যেক দুঃখকষ্ট ও বিপদের মধ্যে আগে কদম বাড়িয়েছে। অতএব, সন্দেহ নেই যে, **আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন রূহানিয়াত কায়েম করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আদম। বরং, প্রকৃত আদম তিনিই ছিলেন**। তাঁরই (সাঃ) মাধ্যমে এবং তাঁরই বদৌলতে সমস্ত মানবীয় উৎকর্ষতা চরমে পৌঁছেছিল। এবং মানবিক স্বভাবের কোন শাখা-প্রশাখাই নিষ্ক্রিয় থাকেনি, নিষ্ফল থাকেনি। নবূয়্যত তাঁর (সাঃ) উপরেই পূর্ণ হয়েছে, এবং তা শুধু যুগান্তের প্রেক্ষিতেই হয়নি, বরং তা এজন্যেও হয়েছে যে, নবুয়্যতের সমস্ত সাফল্য, সৃজনশীলতা, উৎকর্ষতা অর্থাৎ তামাম কামালাতে নবূয়্যত তাঁর (সাঃ) মধ্যেই চরমত্বে পৌঁছেছে। এবং যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর সর্বোত্তম প্রকাশক ও প্রকাশস্থল, সেহেতু,তাঁর শরীয়ত ছিল জালালী ও জামালী, গৌরব ও সৌন্দর্য-এর পূর্ণ আধার। আর, এ কারণেই তাঁর নাম দু'টি, **'মুহাম্মদ'** এবং **'আহমদ'** সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এবং তাঁর নবূয়্যতের মধ্যে কোনও প্রকারের কোনো কৃপনতা নেই, বরং তা আদি থেকেই তামাম দুনিয়ার জন্য বিদ্যমান রয়েছে।'

– (লেকচার ঃ শিয়ালকোট, পৃ ঃ ৪-৭, ১ম সংস্করণ)।

(৫৮)

'সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার আসল বিশেষত্ব এই যে, তিনি (সাঃ) হলেন পৃথিবীর জন্য **সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা-'মুরুব্বীয়ে আজম'**। তাঁর (সাঃ) হাতেই পৃথিবীর সর্বগ্রাসী দুর্নীতিপরায়ণতা-'ফাসাদে আজম' দূরীভূত হয়েছে। তিনিই হারানো তৌহিদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং পুনরায় তা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই সমস্ত বাতিল ধর্মকে দলীল-প্রমাণের দ্বারা পরাভূত করেছেন। তিনিই সমস্ত বিপথগামীদের সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করেছেন। তিনিই প্রত্যেক নাস্তিক ও সংশয়বাদীর অপচিন্তা বিদূরিত করেছেন। তিনিই নাজাত বা পরিত্রাণের প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করেছেন। এবং সাব্যস্ত করেছেন যে, নাজাতের জন্য কোন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ক্রুশে লটকানোর কোনও প্রয়োজন নেই। এবং খোদাকে তাঁর স্থায়ী ও আসল স্থান থেকে নামিয়ে এনে কোন নারীর গর্ভে প্রবিষ্ট করারও কোন প্রয়োজন নেই। তিনিই পরিত্রাণের নীতি-দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, এথেকেই প্রমাণিত যে, তাঁর কল্যাণ, তাঁর আশিস ও মঙ্গলময়তা এক্ষেত্রে সবাইকে অতিক্রম করে গেছে। এবং তাঁর মর্যাদা ও তাঁর স্তর সকলেরই উর্ধ্বে। ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে,আসমানী গ্রন্থসমূহ সাক্ষ্যদান করছে এবং যার চোখ আছে সে

স্বয়ং দেখতে পাচ্ছে, সেই নবী যিনি এ সমস্ত বিষয়েই সকল নবীগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।'

– (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ৯৭, হাশিয়া ৬)।

(৫৯)

'লক্ষ্যণীয় যে, কত ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর নবূয়্যতের দাবীর উপরে, হাজারো বিপদাবলী এবং লাখো মানুষের বিরোধিতা, বৈরিতা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অবিচলরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বছরের পর বছর ধরে এমন সব মুসিবতের মধ্যে কাটিয়েছেন, এমন সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, যা সফলতার ক্ষেত্রে দৃশ্যতঃ সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করে তুলছিল। এবং এই অবস্থা দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়ে চলছিল। এই অবস্থা কোন পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে ধৈর্য্য ধারন করা কল্পনারও বাইরে ছিল। এছাড়া, নবুয়্যতের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যা কিছু ছিল, তা সবই বিসর্জন দিতে হয়েছিল। মাত্র একটা কথার বিনিময়ে লাখো মতপার্থক্য ক্রয় করতে হয়েছিল। হাজারো দুর্যোগ মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। হত্যাকারীরা হত্যার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। বাড়ীঘর, আসবাব-পত্র সব ধ্বংস হয়েছিল। বার বার বিষ প্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। হিতাকাংখীরা অহিতাকাংখী হয়েছিল। বন্ধুরা শত্রু হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে তাঁকে (সাঃ) এমন সব দুখঃকষ্ট পোহাতে হয়েছিল, যা দৃঢ়তার সঙ্গে বরদাস্ত করে যাওয়া কোন ধূর্ত ও প্রতারকের পক্ষে সম্ভব নয়। এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন ইসলামের বিজয় এলো, তখন সেই সম্পদ ও সৌভাগ্যের দিনেও তিনি কোন সম্পদ সঞ্চিত করেননি। কোন দালান–কোঠা নির্মাণ করেননি। আরাম ও আয়েশের কোন বন্দোবস্ত করেননি। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের কোন চেষ্টা করেননি। হাতে যা কিছু আসতো তা সবই এতীম, মিসকীন, বিধবা ও ঋণগ্রস্থদের কল্যাণে বিতরণ করে দিতেন। তিনি কখনোই এক বেলাও পেটপূরে খাননি। তিনি এতো স্পষ্ঠভাষী ছিলেন যে, তাঁর হাঁকফুকার তৌহিদের বক্তৃতার কারণে তিনি সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, এক কথায় সারা পৃথিবীর লোকদেরকে যারা পৌত্তলিক ছিল, সর্বেশ্বরবাদী ছিল, তাদের সবাইকে বিরোধী করে তুলেছিলেন। তাঁর আপনজন ছিল যারা তাদেরকে মূর্তি পূজা করতে বারণ করে সবার আগেই দুষমন বানিয়েছিলেন। ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিগড়ে গিয়েছিল। কেননা, তিনি তাদের নানা ধরনের সৃষ্টি–পূজা, পীর–পূজা এবং বদ আমল বা অপকর্ম থেকে প্রতিহত করেছিলেন, এবং হযরত মসীহ (আঃ)-এর উপরে মিথ্যা দোষারোপ ও অবমাননা করা থেকে বারণ করেছিলেন। ফলে, তাদের দারুন অন্তর্জালা সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই, তারা তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। একইভাবে তিনি খৃষ্টানদেরকেও ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলেন। কেননা, তিনি তাদের বিশ্বাসমতে ঈসা (আঃ)-কে না খোদা, না খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতেন, না তাঁকে ক্রুশে নিহত পরিত্রাণকারী বলে স্বীকার করতেন। অগ্নি-পূজক এবং নক্ষত্র-

পূজকরাও নারাজ হয়ে গিয়েছিল। কেননা, তাদেরকেও তাদের দেবতাদের পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এবং তৌহিদকেই নাজাত বা পরিত্রাণের উপায় বলে স্থির করা হয়েছিল। এখন বলুন, ইনসাফের সঙ্গে বলুন, এই-ই কি ছিল পার্থিব বিজয় অর্জনের পথ ?'

– (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ১০৮, ১০৯)।

(৬০)

'আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন এক অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী। তিনি খোদার রাস্তায় প্রাণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ভয় ও আশা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি খোদার উপরে পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি খোদাতায়ার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত ছিলেন। তিনি এ কথার কোন পরওয়া করতেন না যে, তৌহিদের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য কি কি বিপদ তার মাথায় পড়তে পারে এবং মুশরেকরা কি কি দুঃখকষ্টে তাঁকে ফেলতে পারে। বরং, সমস্ত দুঃখ–দুর্দশা, বৈরিতা, বিরোধিতা, এবং আপদ–বিপদ মাথা পেতে নিয়ে তিনি আপন প্রভুর হুকুম পালন করে গেছেন। এবং প্রচার কার্যের ও উপদেশ দানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শর্তাদি পূরণ করেছেন। তিনি ভয়–ভীতি প্রদর্শনকারীদেরকে কোন গুরুত্বই দেন নি। আমরা সত্য সত্যই বলছি যে, সমস্ত নবীদের মধ্যে (আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত) এমন আর কেউই ছিলেন না, যিনি সমস্ত বিপদাবলীর সময়ে খোদার প্রতি এতো বেশী নির্ভরশীল থেকে খোলাখুলিভাবে শিরক এবং সৃষ্টি–পূজার বা সর্বেশ্বরবাদিতার বিরোধিতা করেছিলেন, এবং সকল শত্রুদের সর্বপ্রকারের শত্রুতার মোকাবেলায় এতো বেশী অটল, অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল ছিলেন।'

– (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ১১১)।

(৬১)

'রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনে তের বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যে সকল দুঃখ-দুর্দশা ও নির্যাতন-নিপীড়ন পোহাতে হয়েছিল তার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। তার কথা ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে। এখেকেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উন্নত সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতা, হৃদয়ের উদারতা, আত্ম-প্রত্যয় ও অধ্যবসায়, এবং অটল অবিচলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কত বিশাল পর্বত-প্রমাণ পুরুষ ছিলেন তিনি ! বিপদাবলীর পাহাড় তাঁর উপরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁকে এতটুকুও হেলাতে পারেনি। আপন দায়িত্ব পালনে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও পিছপা হননি, কিংবা চিন্তিত হয়ে পড়েননি। কোন বিপদ, কোন দুঃখ–বেদনাই তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে সামান্যতমও সরাতে পারেনি। অনেক লোক ভ্রান্ত উপলব্ধির দরুন বলে থাকে যে, তিনি (সাঃ) তো ছিলেন খোদাতায়ালার প্রিয় বন্ধু, পছন্দকৃত, মনোনীত। তবু, তাঁর উপরে এতো দুঃখ-কষ্ট, এতো বিপদ–আপদ এসেছিল

কেন ? আমি বলি কি যে, পানির জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জমিন খোঁড়া না হয়, তার কলিজা অর্থাৎ অন্তরের স্তর ভেদ করা না হয়, ততক্ষণ তো পানি পাওয়া যায় না। মৃত্তিকা-গর্ভে গর্ত গভীর থেকে গভীরতর করতে থাকলে এক না এক সময় সেই সুপেয় পানি পাওয়া যায় যা জীবনদায়িনী শক্তি। একইভাবে, খোদাতায়ালার রাস্তায় সেই লজ্জত বা তৃপ্ত-আনন্দ লাভ করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিপদ-আপদ ও দুঃখ-বেদনায় স্থৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করা হয়। যাদের এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়নি, তারা সেই তৃপ্ত-আনন্দ কোথা থেকে পাবে ! আর কোথা থেকেই বা তা অনুভব করবে! তারা কী করে বুঝবে যে, যখন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে কোন দুঃখ-বেদনা, কোন তকলিফ পতিত হতো, তখন তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্ফুরিত হতো এক পরম তৃপ্তি ও পরমানন্দের প্রস্রবন। তখন খোদাতায়ালার প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতো, ভালবাসা বৃদ্ধি পেতো, বৃদ্ধি পেতো খোদার সাহায্যের প্রতি তাঁর ঈমান।

– (মালফুজাত, খ, ২, পৃঃ ৩০৭)।

(৬২)

'কী ! এটা কি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, একজন দরিদ্র, দুর্বল, নিঃস্ব অসহায়, অশিক্ষিত, এতীম, একলা মানুষ এমন এক যামানায়, যখন প্রত্যেকটি জাতি শক্তিতে, সম্পদে, সামরিক প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে, শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, তখন এমন এক উজ্জ্বল আলোময় শিক্ষা নিয়ে এলেন যে, তার সুস্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে দিলেন ? এবং নামজাদা সব লোকেরা, যারা তাদের জ্ঞান জাহির করে বেড়াতো এবং নিজেদেরকে ফিলসফার বলে জাহির করতো, তাদের ভ্রম ও ভ্রান্তিসমূহকে (সংশোধন করার জন্য) দেখিয়ে দিলেন ? এবং শক্তি সামর্থহীন ও সহায়সম্বলহীন এক দরিদ্র ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, এমন এক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, শক্তিশালী সম্রাটদেরকে পর্যন্ত সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন এবং তাদের জায়গায় গরীবদেরকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন ? এ যদি খোদায়ী সাহায্য ও সমর্থন না হয়, তাহলে এটা কি ? সারা পৃথিবীর উপরে যুক্তি-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, শক্তিতে ও বলে প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করা কি ঐশী সাহায্য ছাড়াই সম্ভব ? লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথম যখন মানুষের কাছে তাঁর নবী হওয়ার দাবী প্রচার করছিলেন, তখন কে ছিল তাঁর সাথে ? কোন সে বাদ্‌শাহ্‌র খাজাঞ্চীখানা ছিল তাঁর কব্জায়, যার উপরে নির্ভর করে তিনি সারা পৃথিবীর মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়েছিলেন? তাঁর কাছে কি এমন কোন সেনাবাহিনী ছিল যার উপরে ভরসা করেই তিনি সমস্ত রাজা-বাদশাহ্‌দের আক্রমণ থেকে নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিলেন ? আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও জানে যে, ঐ সময়ে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভূপৃষ্ঠে একলা ছিলেন, দুর্বল ও সহায়-সম্বলহীন ছিলেন। স্রেফ তাঁর সঙ্গে ছিলেন খোদা, যে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন এক মহান উদ্দেশ্যে।'

– (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ১১৯-১২০)

(৬৩)

'পাঁচ বার আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনে অত্যন্ত নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। জীবন নাশের সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি আল্লাহ্‌তায়ালার রসূল না হতেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁকে হত্যা করা হতো। প্রথম ঘটনা হচ্ছে ঃ

(১) একবার মক্কার কোরেশরা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘর ঘেরাও করে ফেলে এবং কসম খায় 'আমরা আজ তাকে হত্যা করবোই'।

(২) দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে, সেই ঘটনা যখন কাফেরদের বিরাট একটি দল পাহাড়ের সেই গুহার মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, যে গুহাটির ভেতরে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবুবকর রাজি আল্লাহ আনহু গোপনে অবস্থান করছিলেন।

(৩) তৃতীয় বারের নাজুক অবস্থা হচ্ছে সেই অবস্থা, যখন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওহোদ-এর যুদ্ধের ময়দানে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, এবং কাফেররা তাঁকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। এবং কাফেররা তরবারি দিয়ে তাঁর উপরে বহুবার সমবেত আক্রমন চালিয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই তারা ব্যর্থকাম হয়েছিল। এ এক মোজেজা ছিল।

(৪) চতুর্থ দফার ঘটনা হচ্ছে, এক ইহুদী নারী আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে গোস্তের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেতে দিয়েছিল। আর সেই বিষও ছিল অত্যন্ত তীব্র ও মারাত্মক, এবং পরিমানেও তা অনেক বেশী ছিল।

(৫) পঞ্চম বারের ঘটনাও ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল। এবং তাঁকে (সাঃ) গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেছিল।

'এই পাঁচটি ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এইসব দারণ বিপদজ্জনক অবস্থা থেকে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রাণে বেঁচে যাওয়া এবং পরিশেষে সেই সমস্ত শত্রুর উপরে বিজয় লাভ করা এমন এক শক্তিশালী দীলল যে, এথেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সত্য ছিলেন, এবং খোদা ছিল তাঁর সাথে।' – (চশমা মারেফাত, পৃঃ ২৫২, পাদটীকা)।

(৬৪)

'নবীদেরকে এবং ওলীদেরকে এজন্যই আবির্ভূত করা হয় যে, মানুষ যেন তাঁদের নৈতিক গুণাবলীর অনুসরণ করতে পারে। তাঁদেরকে খোদাতায়ালা যে পথে চলার জন্য ইস্তেকামাত বা অবিচল দৃঢ়তা দান করেন, সত্যান্বেষীরাও যেন সেই পথ অনুসরণ করে চলে। একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কোন মানুষের উন্নত নৈতিক গুণের প্রমাণ তখনই পাওয়া যায়, যখন তা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়, এবং তখনই তা মানব-হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারও করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ক্ষমা তখনই প্রশংসনীয় হবে, যখন প্রতিশোধ গ্রহণের

ক্ষমতা থাকা স্বত্ত্বেও ক্ষমা করা হবে। তেমনি, পরহেজগারী বা সংযমশীলতা তখনই প্রমাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য হবে, যখন সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করা হবে। সংক্ষেপে, আম্বিয়া ও আউলিয়া সম্পর্কে খোদাতায়ালার ইচ্ছা এটাই যে, তাঁদের প্রত্যেক প্রকারের চারিত্রিক গুণ যেন প্রকাশিত হয় এবং সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, খোদাতায়ালা তাঁর এই ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য, তাঁদের আলোকিত জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগের জীবন কাটে তাদের দুঃখ-বেদনা আর বিপদ- আপদের মধ্যে, যখন তাদেরকে নানা প্রকারের দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয়, যাতে করে সেই সব গুণাবলী প্রকাশিত হয়, যা কঠিন দুঃখ-দৈন্য, যাতনা-বেদনা ও নিগ্রহের সময়ে ব্যতীত অন্য সময়ে কিছুতেই প্রকাশ পেতে পারে না। যদি তাঁদের উপরে কঠিন বিপদাবলী অবতীর্ণ না হতো, তাহলে কী করে প্রমাণিত হতো যে, তাঁরা সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা কঠিন দুঃখ-বেদনা ও বিপদাবলীর মধ্যে আপন প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন না, বরং তাঁর প্রতি আরও বেশী দ্রুততার সঙ্গে ধাবিত হন। এবং তাঁরা খোদাতায়ালার শোকর গোজারী করেন এই জন্যে যে, তিনি অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে তাঁদেরই প্রতি নেক নজর দিয়েছেন এবং তাঁদেরকেই যোগ্য মনে করেছেন তাঁর নিজের জন্যে এবং তাঁর পথে দুঃখ-যাতনা পোহাবার জন্যে ! অতএব, খোদাতায়ালা তাঁদের প্রতি দুঃখকষ্ট ও মুসিবত অবতীর্ণ করেন এই জন্য যে, যেন তাদের সবার ও সহিষ্ণুতা, তাদের দৃঢ়তা ও সততা, তাঁদের পৌরুষ ও সাহসিকতা তাদের অটল অবিচলতা ও বিশ্বস্ততা মানুষের কাছে প্রমাণিত হয় ; এবং তাঁরা যেন সেই প্রবচনের প্রমাণ হন যাতে বলা হয়েছে, 'অবিচলতা অলৌকিকতার চাইতে উত্তম'-(আল্ ইস্তেকামাতো ফাওকাল কেরামাত)। কেননা, পূর্ণ ধৈর্য কখনই পূর্ণ মুসিবত ও দুঃখ-বেদনা ব্যতীত প্রকাশিত হয় না। এবং উন্নত স্তরের ধৈর্য ও অবিচলতা ও দৃঢ়তা অতি বড় দুঃখের ভূমিকম্প ছাড়া নির্ণীত হয় না। এবং এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, প্রকৃত প্রস্তাবে, আম্বিয়া ও আউলিয়ার জন্য রূহানী নেয়ামত স্বরূপ, যার মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে তাঁদের অসাধারণ অতুলনীয় উন্নত চারিত্র্য প্রকাশিত হয় এবং পরকালে তাঁদের মর্যাদা উন্নীত হয়। খোদা যদি তাঁদের উপরে এই সব দুঃখ-বেদনা ও মুসিবত অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে তাঁরা ঐ সব নেয়ামতও লাভ করতে পারতেন না, এবং জনগণের নিকটে তাঁদের উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সৌন্দর্য উন্মোচিত হতো না। বরং, অপরাপর লোকদের মতই গণ্য হতেন এবং তাদের সমপর্যায়ভূক্ত থাকতেন। তাঁরা যদি তাঁদের সীমিত এই পার্থিব জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আরাম-আয়াসে কাটিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন, তাহলে সেই অবস্থায় না টিকে থাকতো তাঁদের সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ, না পেতেন তাঁরা পরাকালের উন্নত মর্যাদা, না সার্বজনীনভাবে প্রচারিত হতো তাদের অটল ধৈর্যের কথা, পৌরুষের কথা, খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা, সাহসিকতার কথা। তাঁরা ছিলেন মহান, তাঁদের কোন সমকক্ষ নেই। তাঁরা ছিলেন অনন্য সাধারণ, তুলনাবিহীন, একক। তাঁরা তাঁদের গুণাবলীর উৎকর্ষতায় এত উন্নত স্তরের ছিলেন যা কল্পনাও করা যায় না। তাঁরা এতো পরিপূর্ণ ও এতো সাহসী পুরুষ ছিলেন যে, যেন একই দেহের মধ্যে হাজারটা সিংহ, একই শরীরে হাজারো ব্যাঘ্র। ফলে, শক্তি ও ক্ষমতায় তাঁরা মানুষের কাছে অতি মহান। খোদাতায়ালার সান্নিধ্যে অতি কাছাকাছি।

আম্বিয়া ও আউলিয়ার জীবনের দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে, পূর্ণ বিজয়, সৌভাগ্য, সম্পদ ও মর্যাদার, যাতে করে তাঁদের সেই সব চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশিত হতে পারে; যা প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় বিজয়ী হওয়ার, সৌভাগ্যশালী ও সম্পদশালী হওয়ার, শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার। কেননা, নিজেদেরকে দুঃখ-কষ্ট দানকারীদের অপরাধ ক্ষমা করা, নির্যাতনকারীদেরকে বরদাস্ত করা, শত্রুদেরকে ভালবাসা প্রদর্শন করা, অশুভাকাংখীদের শুভাকাংখী হওয়া, সম্পদের প্রতি আসক্ত না হওয়া, সম্পদের কারণে অহংকারী না হওয়া, সম্পদ জমা না করা, কৃপণতা না করা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও দানের দরজা উম্মুক্ত করা, সম্পদ আরাম ও আয়েশের জন্য ব্যবহার না করা, শাসন-ক্ষমতাকে জুলুম ও সীমা লংঘনে প্রয়োগ না করা, -এই সমস্ত গুণাবলী এমন যে, এগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন হয় সম্পদের ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার। এবং এই সমস্ত গুণ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানুষের একই সঙ্গে সম্পদ এবং শাসনক্ষমতার অধিকারী হওয়া। অতএব, যেহেতু, দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদ ও দুর্ভাগ্যের সময়কাল, এবং সম্পদ, সৌভাগ্য ও শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সময়কাল ব্যতীত উল্লিখিত উভয় প্রকারের আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু, ঐশী-প্রজ্ঞার চাহিদা এটাই যে, নবীদেরকে এবং ওলীদেকে উভয় অবস্থার সুযোগ দেওয়া হউক, যা হাজারো নেয়ামত বা প্রাচুর্যে ভরপূর। তবে, এই উভয় অবস্থার সময়কালের আবর্তন প্রত্যেকের জন্য একই তরতিবে বা একই ক্রমান্বয়ে হয় না। বরং, ঐশী-প্রজ্ঞা বা ইলাহী হেকমত কারো কারো জীবনে শান্তি ও স্বস্তির সময়কাল প্রথম ভাগে নির্ধারিত করে এবং দুঃখ-বেদনা ও দুর্ভাগ্যের সময়কাল আসে তাদের জীবনের দ্বিতীয়ভাগে। আবার, কারো কারো জীবনে দুঃখ-দুর্ভাগ্যের সময়কাল আসে আগে, এবং শান্তি ও সৌভাগ্যের বা ঐশী সাহায্যের সময়কাল আসে পরে। আবার, কারো কারো ক্ষেত্রে এই উভয় অবস্থাই গোপন থাকে, এবং কারো কারো ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে, সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী হচ্ছেন, হযরত খাতামুল মুরসালীন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। কেননা, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের জিন্দেগীতে এই উভয় অবস্থাই প্রকাশিত হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে এবং সার্বিকভাবে। এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল এমন তরতিবে বা ক্রমানুসারে, যার ফলে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলী উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছিল। এবং সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছিল, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ‘নিশ্চয় তুমি অতি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর উপরে অধিষ্ঠিত’(৬৮:৫)।

আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলী উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্যান্য নবীগণও ছিলেন উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। কেননা, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামই তাঁদের নবূয়্যতের সত্যায়ন বা তসদীক করেছেন, তসদীক

করেছেন তাদের কেতাবসমূহেরও। এবং তাঁরা যে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন ছিলেন, তা–ও সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, এই সত্য উদ্‌ঘাটনের দ্বারা সেই আপত্তিও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায় যা মসীহ্ (আঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে মনে উঁকি দিতে পারে। কেননা হযরত মসীহ্ আলাইহেস সালামের চরিত্রে উল্লিখিত উভয় প্রকারের গুণাবলীর পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয়নি। বরং এক প্রকার-এর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ প্রমাণিত নয়। কেননা, এটা যদিও ঠিক যে, দুঃখ–মুসিবতের একটা কঠিন সময় তিনি অতিবাহিত করেছিলেন, এবং সে সময়ে তিনি ধৈর্য বা সবর অবলম্বন করেছিলেন, তবু তাঁর সেই সবর–এর পূর্ণতা ও প্রামাণিকতা সুস্পষ্ট সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো তখনই, যখন তিনি তাঁর দুঃখকষ্ট প্রদানকারীদের উপরে বিজয় ও ক্ষমতা লাভ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন অন্তর থেকে। কিন্তু, তেমন অবস্থা তো আসেনি তাঁর জীবনে। যেমন, তা এসেছিল আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লিামের জীবনে।

আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীর উপরে এবং অন্যান্য গোত্রের লোকদের উপরে সার্বিক বিজয় লাভের পর এবং তাদেরকে নিজের তরবারির তলে পাওয়ার পরেও তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। মাত্র সেই কয়েকজন লোককেই শাস্তি দিয়েছিলেন যাদেরকে শাস্তি দেওয়ার প্রত্যক্ষ হুকুম ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এবং ঐ ক'জন অভিশপ্ত অপরাধী ছাড়া বাকী সকল শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্য বিজয় লাভেরপর সকলের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন ঃ 'লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা' **কোন অভিযোগ নেই তোমাদের বিরুদ্ধে আজকের দিনে**। অপরাধীর প্রতি এইরূপ ক্ষমা (সাধারণ ক্ষমা), যা কিনা বিরুদ্ধবাদীদের কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপারে মনে হয়েছিল এবং তারা নিজেদের অপরাধের কথা মনে করে নিশ্চিতরূপে ধরে নিয়েছিল যে, তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, তা দেখে ঘন্টা খানেকের মধ্যে হাজারো মানুষ একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যে ঐশী ধৈর্য বা হক্কানী সবর সেদিন আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রদর্শন করেছিলেন ঐ সমস্ত লোকের দীর্ঘ দিনের কঠিন থেকে কঠিনতম নির্যাতন ও নিপীড়নের মোকাবেলায়, তা সূর্যের ন্যায় তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। যেহেতু, মানব–স্বভাবের মধ্যে এই স্বীকৃতি নিহিত যে, কোন মানুষের ধৈর্যের মহত্ত্ব ও মর্যাদা তখনই পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, যখন সে দীর্ঘদিনের অত্যাচারের পর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা লাভের পরও তার অপরাধ ক্ষমতা করে দেয়, সেহেতু, মসীহ্-এর চরিত্রের ধৈর্য, বিনয় ও সহিষ্ণুতার গুণাবলী যথার্থরূপে প্রমাণিত নয়। এবং এই বিষয়টিও পরিষ্কার নয় যে, তাঁর ধৈর্য ও নম্রতা–সহিষ্ণুতা স্বেচ্ছা প্রণোদিত ছিল, না কি বাধ্যগত ছিল। কেননা, মসীহ্ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কিছুই লাভ করেননি, করলে না হয় দেখা যেতো যে, তিনি তাঁর শত্রুদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন–ক্ষমার, না প্রতিশোধের ?

পক্ষান্তরে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী শত শত ঘটনায় প্রকাশিত হয়েছে, পরীক্ষিত হয়েছে এবং সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়েছে। দয়াশীলতা, মহানুভবতা, বদান্যতা, ত্যাগ–তিতিক্ষা, সাহসিকতা, একনিষ্ঠতা, সন্তোষ ও দুনিয়াদারীর প্রতি অনাসক্তি প্রভৃতি গুণ আঁহযরত সাল্লাল্লাহা আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তায় এমন উজ্জ্বল রূপে, দেদীপ্যমানরূপে ও ঝলমলরূপে প্রতিভাত হয়েছিল যে, শুধু মসীহ্ কেন, বরং পৃথিবীর বুকে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত নবীর আগমন ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে এমন একজন নবীও ছিলেন না যাঁর আখলাক এমন পূর্ণরূপে প্রকাশিত ও প্রতিভাত হয়েছিল। কেননা, খোদাতায়ালা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে বিশাল প্রাচুর্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এবং আঁহযরত (সাঃ) তার সমস্তটাই খোদার রাস্তায় খরচ করেছিলেন, এক পয়সাও নিজের জন্য খরচ করেননি। তিনি না কোন ইমারত নির্মাণ করেছিলেন, না কোন সৌধ। বরং, তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন ছোট একটি কাঁচা কোটায়, যা গরীব মানুষের কোঠার চেয়ে কোনভাবেই উন্নত ছিল না। তিনি তাঁর অকল্যাণকারীদের কল্যাণ সাধান করেছেন। যারা তাঁর (সাঃ) হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়েছিল তিনি তাদের অভাব–অভিযোগের সময় নিজের সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতেন এবং তাদেরকে খুশী করে দিতেন। তিনি মাটির উপরে এক খণ্ড কাপড় পেতেই শুয়ে থাকতেন। বসবাস করতেন ছোট একটা কুটীরে। খেতেন যবের রুটি, তা–ও না থাকলে, না খেয়েই কাটাতেন। দুনিয়ার বহু প্রাচুর্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার দ্বারা কখনই তাঁর পবিত্র হাত ময়লা করেন নি। তিনি সব সময় দারিদ্র্যকে প্রাচুর্যের উপরে এবং নম্রতাকে ক্ষমতার উপরে প্রাধান্য দিতেন। যেদিন তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেদিন থেকে নিয়ে যেদিন তিনি তাঁর পরম বন্ধু 'রফীকে আলা'–এর নিকটে গিয়েছিলেন সেই দিন পর্যন্ত তাঁর দয়াময় প্রভু মওলা করীম ছাড়া তিনি আর কাউকেই, কোন কিছুকেই, কোন গুরুত্ব দেন নি। তিনি হাজার হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, একমাত্র খোদাতায়ালার জন্যই আপনার বীরত্ব, বিশ্বস্ততা এবং অটল অবিচলতা প্রদর্শন করেছিলেন। সংক্ষেপে, মহানুভবতা, বদান্যতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সাহসিকতা, পৌরুষ, ঐশী-প্রেম প্রভৃতি যত উন্নত চারিত্রিক গুণ রয়েছে তা সবই খোদাওন্দ করীম হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত করেছিলেন যে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে না অতীতে দেখা গেছে, না ভবিষ্যতে দেখা যাবে। মসীহ্ আলাইহেস সালামের মধ্যেও এই শ্রেনীর চারিত্রিক গুণাবলী স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়নি। কেননা, এই সকল গুণাবলী, শাসনকর্তৃত্ব এবং সম্পদের অধিকারী না হলে প্রকাশিত হতে পারে না, প্রমানিত হতে পারে না। আর মসীহ্ (আঃ)-এর উভয় প্রকারের গুণাবলী পর্দার অন্তরালেই থেকে গেছে! কেননা, এজন্য প্রয়োজনীয় শর্তই তাঁর ক্ষেত্রে পূরণ

হয়নি। অতএব, এ ব্যাপারে যে আপত্তি মসীহ্ -এর দুর্বল অবস্থার প্রেক্ষিতে উত্থাপিত হতে পারে, তা সম্পূর্ণ রূপেই বিদূরিত করা হয়েছে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ ও পারফেক্ট অবস্থার মধ্য দিয়ে। কেননা, **আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তার মধ্যে প্রত্যেক নবীরই সমগ্রতা ও পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে।** এবং এই উন্নত সত্তার মধ্যেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে মসীহ্ এবং অন্য সকল নবী–রসূলের সন্দেহযুক্ত ও গোপন বা অপ্রকাশিত সমস্ত গুণাবলী, এবং তা সবই অতি উজ্জ্বলরূপেই প্রকাশিত হয়েছে। এবং আল্লাহ্তায়ালা ঐ পবিত্র সত্তার মধ্যে এই অর্থে ও তাৎপর্যে ওহী এবং রেসালাতকে খতম করেছেন যে, সকল কামালাত বা পূর্ণতা, উৎকর্ষতা ও সফলতা তাঁর সত্তাতেই খতম হয়ে গেছে – এতো আল্লাহ্‌র আশিস ও অনুগ্রহ, তিনি যাকে খুশী দান করেন। – (বারাহীনে আহমদীয়া, ২২৬-২৮২, পাদটিকা, ১১)।

(৬৫)

'খোদাতায়ালা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ, দুঃখ–বেদনা, বিপদ–আপদ ও নিগ্রহ-নিপীড়নের; দ্বিতীয়ভাগ, বিজয়-এর। এটা এই জন্য করা হয়েছে যে, দুঃখ-বেদনা ও মুসিবতের সময়ে যে সকল গুণাবলী প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তা যেন সবই সে সময়ে প্রকাশিত হয়; এবং বিজয় ও কর্তৃত্বের সময়ে ছাড়া যে সকল গুণাবলী প্রকাশিত হতে পারে না, সেগুলিও যেন তাঁর চরিত্র থেকে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, সেভাবেই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উভয় প্রকারের চারিত্রিক গুণাবলী দুই পৃথক সময়ে পৃথক অবস্থায় প্রকাশিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। বস্তুতঃ, সেই যে দুঃখ–বেদনা আর মুসিবতের যামানা, যা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনে তের বছর পর্যন্ত মক্কা মুয়াজ্জামায় অতিবাহিত হয়েছিল, সেই যামানার ইতিহাস পাঠ করলে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সেই চারিত্রিক গুণাবলী যা দুঃখ–কষ্ট ও মুসিবতের সময়ে কোন যথার্থ সাধু, সত্যবান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ খোদার প্রতি নির্ভরশীলতা, হাহুতাশ ও রোনাজারি না করা, এবং নিজের কাজে সুস্তি–গাফলতি না করা, কারো ত্রাস প্রদর্শনে ভীত হয়ে না পড়া, প্রভৃতি এমনভাবে প্রদর্শন করেছিলেন যে, কাফেররা সেই অটল-অবিচলতা দেখে ঈমান এনেছিল। এবং তারা এই সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, খোদার উপরে পূর্ণ ভরসা না থাকলে কেউ এইরূপ অটল অবিচলতা দেখাতেও পারে না, এবং দুঃখ–বেদনাকে এইভাবে সইতেও পারে না।

আবার, যখন তাঁর (সাঃ) জীবনের দ্বিতীয় ভাগের সময়কাল এলো, অর্থাৎ যখন বিজয়, শাসনক্ষতা, কর্তৃত্ব ও প্রাচুর্যের যামানা এলো, তখন সেই সময়েও আঁহযতর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ক্ষমাশীলতা, মহানুভবতা, বদান্যতা, সাহসিকতা প্রভৃতি গুণাবলী এরূপ পূর্ণতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল যা প্রত্যক্ষ করে অসংখ্য কাফের ব্যক্তি ঈমান এনেছিল। দুঃখ দিয়েছিল যারা তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। শহর

থেকে বিতাড়িত করেছিল যারা তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাদের অভাবীদেরকে মান-সম্মান দিয়ে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন। পরাভূত ও ধৃত বড় বড় দুষমনদেরকেও মাফ করে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ অসংখ্য লোক তাঁর (সাঃ) চারিত্রিক গুণাবলী দেখে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, খোদার পক্ষ থেকে না হলে এবং প্রকৃতই সাধু-সজ্জন না হলে এইরূপ উন্নত চরিত্রবান হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। একারণেই তাঁর শত্রুদের দীর্ঘদিনের হিংসা-বিদ্বেষও দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অতি উন্নত চারিত্র্য যা তিনি প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন, তা বস্তুতঃ, সেই চারিত্র্যই ছিল যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কোরআন শরীফে। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٣﴾ 'তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামাজ (প্রার্থনা) এবং আমার কোরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রভূ-প্রতিপালক। ৬ঃ১৬৩।'

অর্থাৎ, তাদের বলে দাও যে, আমার এবাদত, আমার কোরবাণী, এবং আমার বেঁচে থাকা এবং আমার মরে যাওয়া খোদারই রাস্তায়। অর্থাৎ তাঁর জালাল বা গৌরব প্রকাশের জন্য, এবং সেই সঙ্গে তাঁর বান্দাদেরক আরাম ও নিরাপত্তা দানের জন্য, যেন আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তারা জীবন লাভ করে।' (ইসলামী উসুল কি ফিলসফী, ১৩৩-১৩৪)।

(৬৬)

'সমস্ত মান-মর্যাদার চেয়ে অধিক ও উন্নত হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদা, যার প্রভাব ও কার্যকারিতা সারা ইসলামী দুনিয়ার উপরে বিস্তারিত। এবং তাঁর (সাঃ) সেই মান-মর্যাদাই পৃথিবীকে জীবন্ত করেছে। যে আরব দেশে ব্যভিচার, মদখোরী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে দেশে হক্কুল এবাদ বা মানবাধিকারকে খুন করা হয়েছিল, সহানুভূতি, পরোপকার প্রভৃতির নাম-নিশানাও ছিল না ; শুধু মানবাধিকার ও মানবপ্রেমই ধ্বংসীভূত হয়ে যায়নি, বরং হক্কুল্লাহ্, বা আল্লাহ্ প্রেম ও আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য অধিকতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী আরোপিত হয়েছিল পাথর, বৃক্ষ-লতা ও নক্ষত্রাদির উপরে। বিভিন্ন প্রকারে শিরক্ বা অংশীবাদিতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্বল মানুষের এমনকি মানুষের লজ্জাস্থান বা লিঙ্গেরও পূজা করা হতো। এইরূপ ঘৃনিত জঘন্য অবস্থার চিত্র যদি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষের সম্মুখে ক্ষণিকের জন্যেও উন্মোচিত হয়, তাহলে সে এক বিপদসংকুল অন্ধকার অনাচার এবং জুলুমের অতি ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পাবে। পক্ষাঘাত একদিকে আক্রমন করে, কিন্তু এ এমন এক পক্ষাঘাত ছিল যা উভয় পার্শ্বকেই আক্রমন করেছিল। ফাছাদ বা দুর্নীতি, বিশৃংখলা ও অনাচার সারা পৃথিবীকেই গ্রাস করে ফেলেছিল। না জলে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, না স্থলে। এই অন্ধকার ও ধ্বংসাত্মক যামানায় সে দেশে আমরা দেখেছি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব। তিনি এসে তুলাদণ্ডের উভয় প্রান্তকে

সমান্তরাল অবস্থায় স্থাপিত বা সম্পূর্ণরূপে ব্যালান্স্ড্ করে দিলেন এবং হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল এবাদকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার ও মানুষের অধিকারকে যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চারিত্র্যের পূর্ণ প্রভাব ও কার্যকারিতা তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, যখন ঐ যামানার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। বৈরী ও বিরুদ্ধবাদিরা আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর অনুসারীদের উপরে যে অত্যাচার চালিয়েছে, এবং তাদেরই উপরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পর তিনি তাদের সহিত যে ব্যবহার করেছেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর (সাঃ) উন্নত চরিত্রের মহিমা।

আবূজহল এবং তার সঙ্গীসাথীরা এমন কোন্ অত্যাচার বাকী রেখেছিল যা তারা করেনি আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আত্মোৎসর্গীত অনুসারীদের উপর ? গরীব মুসলিম নারীদেরকে উটের সঙ্গে বেঁধে দুই বিপরীত দিকে উটগুলিকে ছুটিয়ে দেওয়া হতো, এবং তারা চিরে দু'খণ্ড হয়ে যেতো। এবং এটা করা হতো শুধু এই কারণে যে, তারা কেন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর উপরে ঈমান এনেছিল। কিন্তু, এর মোকাবেলায় চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে আঁহযরত (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর-'লা তাস্‌রিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা'-(তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেই আজ) বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এ এমন এক চারিত্রিক ঔৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা যা আর কোন নবীর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।

'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলে মুহাম্মদ।'

– (মালফুজাত, খ, ২, পৃঃ ৭৯-৮০)।

(৬৭)

'আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে জামায়াত বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন, সেই জামাতের লোকেরা তাঁদের রসূলে মকবূল (সাঃ)-এর রাস্তায় এমন ঐক্য ও সংহতি এমন একাত্মতা সৃষ্টি করেছিলেন যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তাঁরা সবাই সত্যি সত্যিই একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন এবং তাঁদের জাহেরী ও বাতেনী জীবন নবুয়্যতের রঙে এমনভাবে রঙিন হয়ে ওঠেছিল যে, তাঁরা প্রত্যেকেই আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিবিম্বে পরিণত হয়েছিলেন। অতএব, আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের এই যে মোজেজা, যার ফলে কট্টর মূর্তি-পূজকেরা খোদাতায়ালার একনিষ্ঠ এবাদতকারীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং সর্বক্ষণ দুনিয়াদারিতে নিমগ্ন ব্যক্তিরা মাহ্‌বুবে হকীকি-প্রকৃত প্রিয়তম-খোদার সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন যে, সেই প্রিয়তমের রাস্তায় নিজেদের রক্ত পানির মত প্রবাহিত করে দিয়েছেন। এটা আসলে সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, তারা এক সত্য এবং পূর্ণ নবীর সাহচর্যে তাঁদের জীবন কাটিয়েছিলেন।'

– (ফতেহ ইসলাম, পৃঃ ২১-২২)।

'আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন এক অতীব মহান সাফল্যমণ্ডিত জীবন। তা সে ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাবলীর পরম উৎকর্ষতায় হোক, আর পবিত্রকরণ শক্তির ক্ষেত্রেই হোক, দৃঢ় চিত্ততার অবিচলতার ক্ষেত্রেই হোক, আর তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার সৌন্দর্য, সাফল্যের ও পূর্ণতার ক্ষেত্রেই হোক, আর তাঁর উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেই হোক, আর তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হওয়া বা কবুলিয়তে দোয়ার ক্ষেত্রেই হোক। এক কথায়, তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই, প্রতিটি অবস্থাতেই অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, যা দেখে একজন স্বল্প থেকে স্বল্প বুদ্ধির মানুষও, যদি যে তার হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে, তাহলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন–'আল্লাহর গুণাবলীতে গুণান্বিত হও'-এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং পরিপূর্ণ মানব–ইনসানে কামেল।'

– (লেকচার, ১০ই এপ্রিল, ১৯০২, পৃঃ ৫)।

(৬৯)

'সেই যে আরব মরুর দেশে এক বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মোর্দা অল্পদিনের মধ্যেই জিন্দা হয়ে ওঠেছিল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিপথগামী ও বিভ্রান্ত লোকেরা ঐশী রঙে রঙিন হয়ে ওঠেছিল, দৃষ্টিহারা লোকেরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল, বোবা ব্যক্তিদের জবানে ঐশী মারেফাত বা তত্ত্বোপলব্ধির কথা জারি হয়ে গিয়েছিল, এবং পৃথিবীর বুকে একই সঙ্গে এমন এক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে। কিন্তু জান কি যে, কি ছিল তা ? (যে জন্য সম্ভব হয়েছিল ঐ ঘটনা ?) **তা ছিল এক ফানা ফিল্লাহ–এক খোদার মধ্যে বিলীন–ব্যক্তির অন্ধকার রজনী সমূহের কাতর প্রার্থনা**, যা শোর ও কোলাহল তুলেছিল পৃথিবীতে এবং সেই সঙ্গে এমন সব বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করেছিল, যা সেই অনক্ষর, অসহায়ের পক্ষে অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হতো।

ও আল্লাহ্ ! আশিস ও কল্যাণ ও শান্তি বর্ষণ কর তাঁর উপরে এবং তাঁর অনুসারীদের উপরে তাঁর দুঃখকষ্ট ও ব্যথা–বেদনার অনুপাতে, তাঁর উম্মতের উপরেও, এবং বর্ষণ কর তাঁর উপরে তোমার রহমতের আলোকের ধারা।'

– (বারাকাতুদ্ দোয়া, পৃঃ ১০)।

(৭০)

'ইসলামের সূচনা লগ্নে যা কিছু ঘটেছিল, তা সবই ছিল আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সেই সব দোয়ারই ফল, যা তিনি চেয়েছিলেন কেঁদে কেঁদে মক্কার অলিতে গলিতে আল্লাহ্র কাছে, যে মহান বিজয় অর্জিত হয়েছিল, যা সারা পৃথিবীর চেহারা ও কার্যকলাপ পাল্টে দিয়েছিল, তা সবই ছিল আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রার্থনারই ফল। নইলে তো সাহাবীদের (রাজি আল্লাহোতায়ালা

আনহুম) শক্তির অবস্থা এই ছিল যে, বদরের যুদ্ধের সময় তাঁদের হাতে ছিল মাত্র তিনটি তরবারি, এবং তা–ও ছিল কাঠের তৈরী।'

– (আল্ হাকাম, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬, পৃঃ ৪)।

(৭১)

'আমাদের প্রভু ও নেতা আঁহযত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সংস্কার ও সংশোধন ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের, সর্বজনীন এবং সর্বজনস্বীকৃত। এবং এতো উঁচু স্তরের সংস্কার ও সংশোধন অতীতের কোন নবীর দ্বারাই সম্ভব হয়নি। কেউ যদি আরবের ইতিহাস সামনে রেখে চিন্তা করে দেখে,তাহলে সে দেখতে পাবে যে, সেই যামানায় মূর্তি–পূজক, খৃষ্টান ও ইহুদীরা কত বেশী গোঁড়া ও ধর্মান্ধ ছিল, এবং কীভাবে তাদের সংশোধন করা হয়েছিল, যা শত শত বৎসর যাবৎ অসম্ভব বলে হতাশায় পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখুন, কোরআনের শিক্ষা, যা কিনা সম্পূর্ণরূপে তাদের বিরোধী ছিল, তা কত কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের উপরে। এবং কত কার্যকরভাবে প্রত্যেকটি মিথ্যা ধর্মমত ও প্রত্যেকটি পাপকর্মকে উৎখাত করেছিল। শারাব, যা সকল কুকর্মের জননী, তাকে বিদূরিত করা হয়েছিল, জুয়াখেলার কৃষ্টিকে মিটিয়ে ফেলা হয়েছিল, শিশু–কন্যা হত্যা প্রথার মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। এবং যা কিছু মানবিক দয়া–মায়া, সুবিচার ও পবিত্রতার প্রতিকূল ছিল, তা সবই অপসারিত করা হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, এটাও ঠিক যে, অপরাধীরাও তাদের অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। কাজেই, ইসলাহ্ বা সংশোধনের কাজ এমনভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল যে, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।' – (নূরুল কোরআন, নং ১, পৃঃ ৩৭, পাদটীকা।)

(৭২)

'আমাদের হিসেবে আঁহযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাক্ষ্য–প্রমাণের চেয়ে বড় সাক্ষ্য–প্রমাণ আর নেই। এই কথা শুনলে তো আমাদের শরীর কেঁপে ওঠে যে, কোন ব্যক্তির সামনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফয়সালা পেশ করা হয়েছে, এবং সে তাঁর সেই ফয়সালা মানেনি, এবং সে অন্য দিকে মুখ ফেরায়ে নিয়েছে।'

– (এতমামুল হুজ্জা, পৃঃ ১১)।

(৭৩)

'মুসলমান হচ্ছে সেই জাতি যারা নিজেদের নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইজ্জতের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়। তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার মত বেইজ্জতির চাইতে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে, যাদের দিবারাত্রির কাজই হলো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করা এবং তাদের বই–পুস্তকে,

পত্র–পত্রিকায়, ইশ্‌তেহার ইত্যাদিতে অত্যন্ত অবমাননার সঙ্গে তাঁর (সাঃ) নাম উল্লেখ করা, এবং তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষা ব্যবহার করা। মনে রাখতে হবে যে, এই শ্রেনীর লোকেরা তাদের নিজেদের জাতিরও হিতাকাংখী নয়। কেননা, তারা তাদের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেয়। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, জঙ্গলের বিষধর সর্প এবং অরণ্যের হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সম্ভব নয়, যারা খোদাতায়ালার পবিত্র নবী গণের মর্যাদার বিরুদ্ধে কুকথা বলা থেকে বিরত না হয়, তারা মনে করে যে, গালমন্দ করা ও অকথা–কুকথা বলার মধ্যেই তাদের বিজয় নিহিত। কিন্তু, প্রত্যেক বিজয় তো আসে আসমান থেকে।'

– (সংযুক্তি প্রবন্ধ ঃ চশমা মারেফাত, পৃঃ ১৪)।

(৭৪)

'এই যামানায় দ্বীন ইসলাম ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের যত অবমাননা করা হয়েছে এবং ঐশী শরিয়তের উপরে যত আক্রমণ চালানো হয়েছে, এবং যেভাবে ধর্মত্যাগ ও ধর্মদ্রোহিতার দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে, তার কোনদৃষ্টান্ত কি অন্য কোন যামানায় পাওয়া যাবে? এটা কি সত্য নয় যে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই হিন্দুস্থানেই প্রায় এক লক্ষ লোক খৃষ্টান হয়ে গেছে ? এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটিরও বেশী বই–পুস্তক রচনা করা হয়েছে ? এবং বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা নিজেদের পবিত্র ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছে ? এমনকি, যারা নিজেদেরকে রসূলের (সাঃ) বংশধর বলে দাবী করতো তারাও খৃষ্টান ধর্মের ধর্মীয় পোষাক পরিধান করে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রু হয়ে গেছে ? এবং তারা এমন মিথ্যা অপবাদ এবং অবমাননা এবং বদনাম ভরা কেতাব–পুস্তক নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে যা শুনলেই শরীর শিউরে ওঠে, এবং হৃদয় কেঁদে কেঁদে এই সাক্ষ্য দান করে যে, যদি এই সব লোক আমার ছেলেমেয়েদেরকে আমার চোখের সামনেই হত্যা করতো, এবং আমার প্রাণপ্রিয় আত্মীয় স্বজনদেরকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতো, এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনা দিয়ে আমাকে হত্যা করতো এবং আমার সমস্ত ধন–সম্পত্তি লুন্ঠন ও দখল করে নিত, তাহলেও আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহর কসম, আমার এতো দুঃখ হতো না, এবং আমি হৃদয়ে সেই দুঃখ পেতাম না, যে দুঃখ আমি পাই, তাদের সেই সব গালমন্দ ও অপমানকর কথায়, যা তারা বলে আমার রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে।'

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৫১–৫২)

কবিতা থেকে উদ্ধৃতি

(এক)

হে আল্লাহ্‌র কল্যাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণ !

লোকেরা তোমার দিকে ওষ্ঠাগত-প্রাণ পিপাসার্তের ন্যায় ছুটে আসছে।

হে সৌন্দর্য ও মায়া মমতার দেশের সূর্য।

তুমি মানুষের আবাসী ও অনাবাসী সকল অঞ্চলের চেহারা আলোকিত করেছ।

হে সেই অস্তিত্ব ! যে আপন আলো ও আলোর কিরণে সূর্য ও চন্দ্রস্বরূপ;

সে তার আপন আলোকে আলোকিত করেছে দিন ও রাত্রিকে।

নিশ্চয় আমি তোমার ঝলমলে আলোকোজ্জ্বল চেহারায়

এমন এক মহিমা দেখতে পাচ্ছি যা মানবীয় গুণাবলীকে অতিক্রম করে গেছে।

তোমার সমীপে লোকেরা ছুটে এসেছে উলঙ্গের ন্যায়

তুমি তাদেরকে ঈমানের চাদরে আবৃত করেছ।

তিনি শত শত বর্ষের মৃতদেরকে মুহূর্তে জীবন্ত করেছেন

কে আছে এমন যে, এই মহিমায় তাঁর মত হতে পারে ?

লোকেরা সাঁঝের শারাবের তৃপ্তি ও আনন্দ বর্জন করেছে

পরিবর্তে, রাতের প্রার্থনার তৃপ্তি–আনন্দে বিভোর হয়েছে।

তিনি আপনার পূর্ণতায়,সৌন্দর্যে, গৌরবে এবং হৃদয়ের শুদ্ধতায় ও প্রসারণে

সারা সৃষ্টির উর্ধ্বে উপনীত।

হযরত ঈসা (আঃ) তো চুপচাপ মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু
আমাদের নবী (সাঃ) জিন্দা আছেন,
খোদার কসম ! তিনি তাঁর সাক্ষাৎ দানে আমাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন।

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৫৯৪-৬)

(আরবী কবিতার উর্দু তর্জমা থেকে বঙ্গানুবাদ। আরও কয়েকটি আছে।
দ্রঃ 'শানে রসূলে আরাবী, সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম'।)

(দুই)

পাপাচারী জালেম লোকেরা তাদের জুলুম ও পাপের কারণে
বিদ্রোহ করে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়;
কিন্তু সত্য, এমন জিনিস যে, এ সম্ভবই নয়
যখন সে প্রকাশিত হয়, তখন জগত তাকে অস্বীকার করে।

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসার পর প্রশংসা, কেননা,
আমরা আমাদের নেতা ও পথিকৃৎ–মুক্তেদাকে চিনতে পেরেছি।

তিনি এমন এক লাইলাতুল কদর (ফয়সালার রাত্রি)
যা আমাদেরকে চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ দান করে।

(কারামাতুস সাদেকীন)

(তিন)

সেই তো আমাদের নেতা যাঁর থেকে আসে সব আলো,
নাম তাঁর মুহাম্মদ (সাঃ), প্রিয়তম আমার সে-ই।

পর্দা যা ছিল অপসারিত করে ভিতরের পথ দেখিয়েছে,
দিল্ প্রিয়ের সাথে মিলিয়েছে, দয়িত তো সে-ই।

সেই তো আজ ধর্মের সম্রাট রসূলগণের মাথার মুকুট
সে পবিত্র এবং সে বিশ্বস্ত, তার প্রশংসা তো এ-ই।

সেই আলোর তরে আমি উৎসর্গিত, আমি তো হয়েছি তাঁরই,
সে-ই তো বিদ্যমান, আমি কী বস্তু ! ব্যস্, ফয়সালা এই-ই।

(কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম, পৃঃ ৪৮)

(চার)

মুস্তফা (সাঃ) খোদাতায়ালার চেহারার আয়না,
তাঁর মধ্যে খোদাতায়ালার গুণাবলী প্রতিবিম্বিত !

প্রত্যেক নবীর নূর তাঁরই মাধ্যমে প্রাপ্ত,
প্রত্যেক রসূলের নাম তাঁরই কারণে আলোকিত।

(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, খৃঃ ৪, পাটীকা)

(পাঁচ)

আমার প্রাণ ও মন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সৌন্দর্যে বিভোর
আমার সত্তা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশধরের গলিপথে উৎসর্গীত।

আমি আমার হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে দেখেছি, এবং চেতনার কান দিয়ে শুনেছি,
সর্বত্রই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সৌন্দর্যের প্রতিরূপ আর প্রতিধ্বনি।

(ফারসীর উর্দু থেকে বাংলা ঃ আখবার রিয়াজ হিন্দ, অমৃতসর, মার্চ ১, ১৮৮৪)

(ছয়)

আহ্‌মদ (সাঃ)-এর শান খোদাওন্দ করীম ছাড়া কেউ জানে না,
তিনি তাঁর খুদী থেকে এমনভাবে জুদা হয়ে গেছেন যে,
'মীম' মাঝখান থেকে খশে পড়েছে।

তিন তাঁর প্রিয়তমের মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে গেছেন যে, পূর্ণ মিলনের ফলে
তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে রব্বে রহীম-এর সূরত পেয়ে গেছে।

চাহে তো কেউ আমার প্রতি বিদ্রোহ ও গোমরাহী আরোপিত করুক,
আমি আহ্‌মদ (সাঃ)-এর হৃদয়ের বাড়া 'আরশে আজিম' আর দেখিনি।

(ফারসী থেকে উর্দুর বাংলা ঃ তৌজিহ মারাম, পৃঃ ৩৩)।

(সাত)

খোদার পরে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর
যদি এটাই কুফরী হয়, তাহলে খোদার কসম, আমি শক্ত কাফের।

(ফারসী থেকে ঃ এজালা আওহাম, খঃ ১ পৃঃ ১৫৬)।

(আট)

তিনি মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি ও কল্পনারও উর্দ্ধে
চিন্তা–কল্পনার সাধ্য কি যে, সেই কিনারাহীন সাগরের কূল পায় ?

তাঁর আত্মা কওলে 'বালা'–(হ্যাঁ) বলাতে–সর্বপ্রথম ছিল,
তিনি তৌহিদের আদম ছিলেন, আদমের পূর্বেই তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল খোদার সাথে।

হে আল্লাহর রহমত ! আমি তোমার রহমতের প্রার্থী হয়ে এসেছি,
তোমার দুয়ারে আমার মত লক্ষ লক্ষ প্রার্থী উপস্থিত।

সেই টোলপড়া চিবুকে আমি লক্ষ ইউসুফের সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি ;
তাঁর নিঃশ্বাসে অগণিত মসীহ্ নাসেরী পয়দা হয়েছে।

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)

(নয়)

আমার মাথা আহ্‌মদ (সাঃ) এর পদধূলিতে উৎসর্গীত,
আমার হৃদয় তাঁর তরে প্রতি মুহূর্তে কোরবান হয়ে আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জুল্‌ফির কসম !
আমি তো সেই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নূরানী চেহারার জন্য আত্মোৎসর্গীত।

আমি যদি শত শত বার তাঁর রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেই, তবু আমার
আফসোস থেকে যাবে যে, তা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শানের উপযোগী হয়নি।

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

(দশ)

আমি খোদা তায়ালার ভয়ে তাঁকে (সাঃ) খোদা তো বলি না, কিন্তু
খোদার কসম, তাঁর সত্তা মর্তবাসীর জন্যে দীদারে ইলাহীর দর্পণ।

(কিতাবুল বারিয়া, পৃঃ ১২৯)।

(এগার)

আকাশ ও পৃথিবী এই ভালবাসায় চক্কর খেয়ে ছুটে চলেছে যে,
ওদের উপরে তাঁর (সাঃ) পায়ের স্পর্শ লেগেছিল।

ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুণ,
আপনার ছাড়া আর কারো সম্পর্কের কোন প্রয়োজন নেই আমার।

আমি আপনার আস্তানায় ধুলিকণার মত পড়ে আছি,
আপনি আমার মাথায় বদান্যতার হাত বুলিয়ে দিন।

তিনি (সাঃ) দোজাহানের প্রশংসিত বাগিচা,
আমরা যারা তাঁর রূহানী সন্তান, তারা সবাই লাল গোলাপের ফুল।

[শানে রসূলে আরাবী (সাঃ)]

(বার)

তাঁর (সাঃ) মর্তবা খোদাতায়ালার আরশে পৌঁছে গেছে,
সাতও জান্নাত তাঁর পদতলে অবস্থিত।

তিনি (সাঃ) খোদাতায়ালার আয়না
তাঁর মধ্যেই প্রতিবিম্বিত খোদাতায়ালার গুণাবলী।

(তের)

আমার প্রিয়তম যেমন, তেমন বন্ধু আর নেই,
তাঁর (সাঃ) শহরে চন্দ্র এবং সূর্যেরও কোন কদর নেই।

(বারাহীনে আহমদীরা, খ, ৪, পৃঃ ৭০৬, উপ-পাদটীকা)।

(চৌদ্দ)

তাঁর (সাঃ) মোকাম তো সেই মোকাম, যেখানে তাঁর আলোর ঝলকে
পবিত্র পাখিরও (জিব্রাঈলেরও) পাখ্না জ্বলে পুড়ে যায়।

(ভূমিকা ঃ বারাহীনে আহমদীয়া, খ-১)।

(পনের)

আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই (সাঃ) প্রেমে বিলীন হয়ে গেছি,
আমি সে-ই হয়েছি, আমি সে-ই হয়েছি, আমি সেই-ই।

(সিরাজে মুনীর)।

(ষোল)

তাঁকে (সাঃ) ছাড়া চারিত্র্য সনাক্ত করা সম্ভব নয়,
তাঁর মধ্যেই সত্যতা ও সাধুতার নিদর্শন প্রকাশিত।
প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তাঁর থেকে দূর, সে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা থেকে দূর
লাখো পর্দায় আবৃত তার হৃদয়।

(দূর্রে মকনুন, পৃঃ ৫২)

(সতের)

রসূলে পাক (সাঃ)-এর আকৃতি-প্রকৃতি আমাদের থেকে আলাদা,
যদিও তিনি আমাদের মধ্য থেকেই, কিন্তু, তবু মনে হয় যেন আমাদের মধ্য থেকে নন।

(দূর্রে মকনুন, পৃঃ ৭৮)

(আঠার)

জিন্দেগী তো আহ্‌মদ (সাঃ)-এর পেয়ালার দান;
কত না প্রিয় এই নাম আহ্‌মদ (সাঃ)।
লাখো আম্বিয়া আছেন, কিন্তু, খোদার কসম,
সবার চেয়ে উন্নত জানি আহ্‌মদ (সাঃ)-এর মোকাম।
আহ্‌মদের (সাঃ) বাগানের ফল আমি খেয়েছি,
আমার 'বুস্তান' সেতো আহ্‌মদেরই (সাঃ) কালাম,
ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ)-এর যিকর ছেড়ে দাও,
তার চাইতে উত্তম জেনো গোলামে আহ্‌মদ।

(উনিশ)

তিনি (সাঃ) যামানার শত শত ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,
তা সবই পূর্ণ হয়েছে।
সেই সমস্ত খবর নিজ নিজ সময়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে,
পূর্বে প্রদত্ত সেই সব খবরে, না কিছু বেশী হয়েছে, না কিছু কম।

(দূর্‌রে মকনুন, পৃঃ ১১৮)

(কুড়ি)

সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন
তিনি (সাঃ) জাগৃতির জগতে আমাকে তাঁর
সেই সৌন্দর্য সেই চেহারা সেই রূপলাবন্য প্রদর্শন করেছিলেন
যে জন্য বসন্তকালও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেছিল।

যদি তুমি চাও যে, খোদাতায়ালা তোমার প্রশংসা করুক,
তাহলে, হৃদয় দিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসাকারী হয়ে যাও।
যদি তুমি একথার কোন প্রমাণ চাও,
তাহলে, তাঁর (সাঃ) প্রেমিক বনে যাও,
কেননা, **মুহাম্মদই (সাঃ) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রমাণ।**

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)

(একুশ)

শত সহস্র সিংহ তাঁর (সাঃ) অস্তিত্বে বিদ্যমান,
উভয় জগতকে নাস্তি থেকে হাস্তি দান করা হয়েছে তাঁরই কারণে।

(দূর্‌রে মকনুন)।

(বাইশ)

তাঁর (সাঃ) চেহারায় খোদাতায়ালার চেহারা প্রতিভাত হচ্ছে ;
তাঁর বারান্দা ও দুয়ার থেকে খোদাতায়ালার খোশবূ আসছে।

(জিয়াউল হক)।

(তেইশ)

'বরতর গুমান ও ওহম ছে আহমদ (সাঃ) কি শান হ্যায়
যেছকা গোলাম দেখো মসীহুজ্জামান হ্যায়।'

আহমদ (সাঃ)-এর মহিমা চিন্তা ও কল্পনারও উর্ধ্বে
তাঁর গোলামকেই দেখো, সে যামানার মসীহ্ হয়েছে।

(ইল্‌হামী পংক্তি)।

(চব্বিশ)

সেই সত্তার কসম, যিনি আসমানকে তাঁর (সাঃ) খাতিরে সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর (সাঃ) আমাদের মত পুত্ররা অস্তিত্ববান এবং তারা কেয়ামত তক হতে থাকবে।

আমি সন্তানের মতই তাঁর (সাঃ) উত্তরাধিকার লাভ করেছি।
এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি আছে যা পেশ করা যায় ?

লোকেরা বলে যে, এই ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওহী প্রাপ্তির দাবী করে,
তাদের কথায় আমি বিস্ময়বোধ করি, কেননা
আমি তো রসূল (সাঃ)-এর প্রতিবিম্ব। এবং
এটা কী করে হতে পারে যে, প্রতিবিম্ব তার আসল-এর বিরুদ্ধ হবে ?
অতএব, যে আলো তাঁর (সাঃ) মধ্যে ছিল,তা-ই
আমার চেহারায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

(এজাজুল মসীহ্)

(পঁচিশ)

আল্লহ্‌র কসম ! আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তাবেদার, এবং
তাঁরই আলোর প্রভায় উদ্ভাসিত করেছি সকল সৌন্দর্যকে সকল মহিমাকে।

– (খোৎবা ইলহামিয়া)।

আল্লাহ্‌র কসম ! তাঁর (সাঃ) ভালবাসা পরিত্রাণের প্রমাণ ও নিদর্শন।
অতঃপর, আমরা কী করে বিফল মনোরথ হতে পারি ?

– (কেরামাতুস সাদেকীন)।

(ছাব্বিশ)

সেই পথে যদি আমাকে হত্যা করা হয় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়
তথাপি, আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)

(সাতাইশ)

জীবন কি জিনিস ?
তাঁরই রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।
স্বাধীনতা কি ?
তাঁরই (সাঃ) কারাগারে শিকারের মত বন্দী হয়ে যাওয়া।

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

(আটাইশ)

এমন কোনও মা নেই যে তাঁর (সাঃ) মত মেহেরবান :
চারিত্র্যে ও সাধুতায় তাঁর কোন তুলনা নেই।

তুমি (হে খোদা) স্বয়ং তাঁকে (সাঃ) 'রউফ ও রহীম' উপাধি দিয়েছ ;
এবং আপন মহানুভবতা, দয়াশীলতা ও সূক্ষ্ম গুণাবলীর প্রকাশস্থল করেছ।

– (দূর্রে মকনুন, পৃঃ ১৩৪)।

(ঊনত্রিশ)

তিনি (সাঃ) তো সেই, যাঁর প্রেম, আনুগত্য ও বন্ধুত্বের কারণে
আমাকে ঐশীবাণী, ইঙ্গিত ও প্রেরণা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।

হে আমার প্রভু (সাঃ) ! হে দুর্বলের আশ্রয়স্থল।
আমি তোমার কাছে জাহেলদের জুলুম থেকে আশ্রয় নিতে এসেছি।

– (আন্‌যামে আথাম)

(ত্রিশ)

সকল তরফে চিন্তা ছুটায়ে পেরেশান শেষে ফিরেছি আমি,
মোহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম ব্যতীত ধর্ম কোথাও পাইনি আমি
এমন কোন ধর্মই নেই যা একটি নিশানও দেখাতে পারে,
এ ফল কেবল মোহাম্মদের বাগিচা থেকেই খেয়েছি আমি।

ইসলামকে তো বার বার আমি যাচাই করিয়া দেখেছি স্বয়ং
আলো শুধু আলো ! ওঠো এবং দেখো !! সবারই কাছে বলেছি আমি।

অন্য তামাম ধর্মে তো আমি দেখিয়াছি আলো কোথাও নেই,
দেখাক না কেউ পারলে যদি সে সত্যকে করি গোপন আমি।

এসো হে লোকেরা ! কেননা কেবল এখানেই পাবে খোদার নূর
প্রশান্তির এই পথ তোমাদের দেখ বাতলিয়ে দিলাম আমি।

যখন হইতে এ আলো পেয়েছি আলোর নবীর নিকট হতে
সত্যের সেই সত্তা হইতে আপন ওজুদ পেয়েছি আমি।

মোস্তফা পরে ঝরুক তোমার সালাম-রহম বেইন্তেহা,
তারই কাছ থেকে এই সব নূর হে খোদা আমার নিয়াছি আমি।

মোহাম্মদের প্রাণে এ প্রাণের মিলন আমার চিরন্তন,
প্রাণ ভরে সেই পেয়ালা হইতে করায়েছি পান দিল্‌কে আমি।

তাদের ধারণা মসিহায়ী এই দাবী আমার
বানোয়াট যাহা তৈরী স্বয়ং করেছি আমি।

গালি শুনিয়াছি তবু হামেশাই ঐ সব লোকে দিয়াছি দোয়া,
রহমতে জোশ ওঠেছে আমার ক্রোধকে নিভায়ে ফেলেছি আমি।

কসম তোমার মুখের জানিও, আমার প্রাণের আহমদ ওগো,
তোমারই খাতিরে এ দুঃখের ভার বরণ করিয়া নিয়াছি আমি।

তব প্রেম দিয়ে ভরপূর হয়ে উঠেছে আমার প্রতিটি অণু
বক্ষে আমার বসায়েছি এক প্রেমের শহর স্বয়ং আমি।
দুশমন সবে পরাভূত আমি করেছি দলিল প্রমাণ দিয়ে,
তল্‌ওয়ার দিয়ে যে কাজ হয় তা' কলম দ্বারাই করেছি আমি।
তব প্রেম দিয়ে আমার হাস্তি সাকল্যে লয় করেছি আমি,
নিজের প্রতিটি অণু-পরমাণু উড়ায়েছি তব পন্থে আমি।
তোমার গুণের সুন্দরতায় খোদার মহিমা দেখিতে পাই,
তোমাকে পেয়েছি তাইতো সেই সে অস্তিত্বকে পেয়েছি আমি।
তব আঁচলের পরশ লভিলে চিরতরে মিলে পরিত্রাণ,
তাইতো তোমার দুয়ার-সমুখে শির ঝুঁকাইয়া দিয়াছি আমি।
কসম খোদার ! দিল্‌ থেকে মোর মুছে গেছে সব অন্য ছবি,
যখন হইতে এ দিলে তোমার নক্সা জমায়ে নিয়েছি আমি।
তোমাকে দেখিয়া দেখেছি ঐশী অসীম আলোর বিচ্ছুরণ,
তব আলো দিয়ে শয়তান সব জ্বালাইয়া ছাই করেছি আমি।
আমরা হয়েছি খায়রে-উমাম তোমারই তরে হে খায়রে—রুসূল।
তুমি বাড়িয়াছ তাইতে কদম অগ্রে বাড়ায়ে দিয়েছি আমি।
মানব-তনয় তুচ্ছ স্বয়ং ফেরেশতারাও সকলে আজি,
গাহিছে তাহাই তোমার-লাগিয়া প্রশংসা যাহা গেয়েছি আমি।
জাতির জুলুমে কাতর হইয়া
প্রিয় মোর এবে তোমারই তরে।
তোমারই প্রেমের গলি-পথে আজ
হাশরের শোর তুলেছি আমি।।

(দূর্রে সমীন)।

(একত্রিশ)

আশ্চর্য আলো রয়েছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণে,
আশ্চর্য ও বিস্ময়কর মুক্তোর দ্যুতি তাঁর (সাঃ) কানে।
হৃদয় সকল অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করে,
যখন তা মুহম্মদ-এর বন্ধুগণের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।
আমি ঐ সকল অর্বাচীনের জন্যে বিস্ময়বোধ করি,
যারা মুহাম্মদ-এর দস্তরখান থেকে মুখ ফেরায়ে নেয়।
আমি দু'জাহানের মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি দেখি না
যে কিনা মুহাম্মদ-এর ন্যায় শান ও শওকতের অধিকারী।
খোদাতায়ালা সেই হৃদয়ের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট
যা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।
খোদা তায়ালা সেই লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত কীড়াকে পুড়িয়ে ফেলেন
যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শত্রুদের অন্তর্ভূক্ত।

হে সম্বোধিত! তুমি যদি কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও, তাহলে
মুহাম্মদ-এর প্রেমের মাস্তানদের আলখিল্লায় প্রবেশ কর।
এই পথে আমাকে যদি হত্যা করা হয়, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়,
তথাপি আমি মুহাম্মদ (সাঃ) দুয়ার থেকে মুখ ফেরায়ে নেব না।
ধর্মের কাজে আমি দুনিয়াকে ভয় পাই না, কেননা
আমার মধ্যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই রঙ প্রত্যক্ষ করা যায়।
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সৌন্দর্য ও কৃপাকে স্মরণ করে
জগৎ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াতেই প্রকৃত স্বস্তি ও প্রশান্তি।
তাঁর (সাঃ) পথে আমার প্রতিটি অনু-পরমাণু উৎসর্গিত, কেননা
আমি মুহাম্মদ-এর গোপন সৌন্দর্য দেখে ফেলেছি।

আমি অন্য কোন উস্তাদের নাম জানি না, কেননা
আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাদ্রাসায় পড়েছি।
অন্য আর কোনও মাহ্‌বুব-এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, কেননা
আমি তো মুহাম্মদ-এর অপরূপ রূপের আঘাতে নিহত হয়েছি।
আমার তো কেবল তাঁর (সাঃ)-ই আঁখির কৃপার প্রয়োজন,
আমার তো অভিলাষ শুধু মুহাম্মদ-এর ফুলবাগানে ভ্রমন করার।
আমার হৃৎপিণ্ডকে তুমি আমার ভেতরে তালাশ করো না,
আমি তো ওটাকে মুহাম্মদ-এর আঁচলে বেঁধে দিয়েছি।

আমি পবিত্র পক্ষীকুলের মধ্যে সেই সুন্দর পাখিটি
যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাগানে তার নীড় বেঁধেছে।
তুমি প্রেমের কারণে আমার প্রাণকে আলোকিত করেছ
হে মুহাম্মদ-এর প্রাণ ! তোমাতে আমার প্রাণ উৎসর্গিত।
আল্লাহতায়ালা এই জওয়ানকে এতো ভীষণ বীরত্ব দান করেছেন যে,
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ময়দানে কোন বেটাই মোকাবেলার সাহস পায় না।
হে অর্বাচীন ও পথভ্রান্ত শত্রুরা ! হোশিয়ার হয়ে যাও,
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কর্তনকারী তরবারির ভয়ে ভীত হয়ে যাও।
আল্লাহ্‌তায়ালার সেই রাস্তা যা লোকেরা গুম করে ফেলেছে,
তা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী ও সহায়তাকারীদের মধ্যে সন্ধান কর।
হে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহিমা ও তাঁর প্রকাশিত আলোকের অস্বীকারকারী !
যদিও তোমরা কারামত-এর নাম ও নিশানা কোথাও দেখতে না পাও,
তথাপি, তোমরা আস এবং মুহাম্মদের (সাঃ) গোলামদের মধ্যেই তা দেখে নাও।

– (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)

(বত্রিশ)

হে পুরস্কারদাতা, বার বার কৃপাকারী !
খোদাতায়ালার কল্যাণরাশির সমুদ্র !

লোকেরা দলে দলে কলসী নিয়ে তোমার পানে ধাবিত হয়েছে।
একটি জাতি তোমার আচার–আচরণের মর্যাদা অর্জন করেছে ;
এবং একটি সম্প্রদায় এই চৌদ্দই রাতের চাঁদের খবর শুনেছে
যারা আমাকে পুরোধা বানিয়ে নিয়েছে।
লোকেরা তোমার রূপসৌন্দর্য দেখে মিলনের তরে ক্রন্দন করছে,
এবং বিচ্ছেদের দহনে কাতর হয়ে আর্তনাদ করছে।

ঐ সমস্ত লোকের প্রতি রসূল (সাঃ)-এর অকাট্য প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছিল,
এ কারণে-ই তাদের প্রবৃত্তির কামনাগুলিও তাদের মূর্তিগুলোর মতই –
টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।
তাদের সেই সব রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করা হয়েছিল,
এবং আল্লাহতায়ালা তাদেরকে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির তুফান থেকে
রক্ষা করেছেন।
বিরুদ্ধবাদীদের জুলুম ও অত্যাচার তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে,
কিন্তু তারা খোদাতায়ালার সহায়তায় অটল ও অবিচল ছিলেন।

আমার দেহ প্রেমের ঘোরে তাঁর (সাঃ) কাছে উড়ে যেতে চায়
আহা ! আমার যদি পাখনা থাকতো – পাখির মত উড়াল দেওয়ার !

হে দিল্ আমার ! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যিকর করো,
যিনি হেদায়াতের ঝরণা–ধারা, এবং দুষমণের ধ্বংসসাধনকারী।
যিনি সাধু, যিনি দয়াশীল, উপকারী ও কৃপাকারী,
যিনি পুরস্কারদাতা ও দানশীলতার সমুদ্র।

তিনি মুস্তফা, তিনি মুজতবা, তিনিই মুক্তেদা,
তাঁর কাছেই সন্ধান করা হয় কৃপা ও পুরস্কার।

বদান্যতার সময়ে হেদায়াতের সমস্ত বারিধারা
তার বর্ষণধারায় একত্রিত করা হয়েছে ;
যামানা এই মুক্তেদার বর্ষণধারার কল্যাণে
ধীরে ধীরে অন্য সকল বৃষ্টিধারাকে ভুলে গেছে।

তুমি সকল প্রকারের গৌরব মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য ছেড়ে দাও,
তাঁর মহিমার প্রখরতার সামনে সূর্য পর্যন্ত ম্লান হয়ে আছে।

– (দুর্রে সমীন)।

'মুহাম্মদ হি নাম আওর মুহাম্মদ হি কাম
আলাইকাস্ সালাতো আলাইকাস সালাম।'

'ফামা আ'জামা শানো কামালেহি
আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহে ওয়া আলেহি।'

—— সমাপ্ত ——